বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী

সোমেন বসু

প্রকাশক :
শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার মিত্র
২৩বি বেথুন রো, কলিকাতা-৬

প্রাপ্তিস্থান :
বুকল্যাণ্ড লিমিটেড
১নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

মূল্য—তিন টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র
এলেম প্রেস
৬৩নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

বাবার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

আত্মজীবনী নিয়ে বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে কোন সুবিস্তৃত আলোচনা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র আলোচনা করেছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। তাঁর আলোচনার পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। সমস্ত বাংলা আত্মজীবনীর আলোচনা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ-যোগ্য বই দুএকখানি বাদ পড়েছে। তবে মোটামুটিভাবে সেইগুলিকে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে যেগুলি কোন না কোন কারণে আত্ম-জীবনীর ধারাবাহিক আলোচনায় বিশেষ মূল্যবান্।

মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের বাংলা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উৎসাহেই আমার এই প্রচেষ্টা। তিনি আমার গুরুস্থানীয়, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর ঋণশোধের কথা ভাবতেও পারি না। এই কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর নীলমাধব সেন আমার অগ্রজতুল্য। সেই দাবীতেই তাঁকে দিয়ে আদ্যোপান্ত প্রুফ দেখিয়ে নিয়েছি। তার পরেও যদি ভুল ত্রুটি থাকে সে দায়িত্ব তাঁরই। আগরতলা বেসিক ট্রেণিং কলেজের শিল্প-অধ্যাপক সুমঙ্গল সেন প্রচ্ছদপটটি এঁকে দিয়েছেন। কাঞ্চন মূল্য যখন দিতে পারিনি তখন মিষ্টি কথার মূল্য কতটুকুই বা। ছাপানোর সমস্ত দায়িত্ব সত্যেন্দ্রকুমার মিত্র নিয়েছেন, কাজ করা তাঁর আনন্দ। আমার অনুরোধের অপেক্ষা রাখেন নি তিনি।

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬
বাংলা বিভাগ
মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ
আগরতলা, ত্রিপুরা

সোমেন বসু

সূচীপত্র

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী

সৃষ্টির মধ্য দিয়ে স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করেন। বিশ্বলোকের কত বিচিত্র ঘটনা, কত অজস্র অনুভূতি স্রষ্টার মনে নানা ধরণের প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। সেই সব প্রতিক্রিয়ার তাড়াতেই শিল্পী তাঁর শিল্প সাধনায় নিত্যনূতন প্রকাশভঙ্গীর সন্ধান সুরু করে দেন। মনের ভিতরে যত কথা ভীড় করে আসে তাদের বিশ্বমানবের মনের দরবারে হাজির করে দেওয়ার জন্য শিল্পীর ভাবনার অন্ত নেই। তারই জন্য যুগে যুগে মানুষ নানা ধরণের সাহিত্যভঙ্গীর আবিষ্কার করেছে। কখনো যুগবেদনাকে প্রকাশ করেছে মহাকাব্যের বিরাট দেহের গজমন্থর গতিতে, কখনো নাটকীয় সংঘাতে, কখনো গ্রাম্য গাথায়। নিজের মনের গোপন কথাটিকে মানুষ গীতিকবিতার মাধ্যমে সময়ে সময়ে রূপ দিয়েছে।

জীবনী লেখার অনেকটা নির্ভর করে ঘটনা সংগ্রহের উপর, কিন্তু আত্মজীবনীর চমৎকারিত্ব নির্ভর করে ঘটনা সংগ্রহের উপর নয়, আত্ম-উপলব্ধির উপর। তাই ঘটনাযোজনা করে জীবনী লেখা যায়, কিন্তু আত্মজীবনী ঘটনা-সংযোজন মাত্রই নয়। জীবনে যার কোন গভীর দৃষ্টি নেই, গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবন যার বোধকে আচ্ছন্ন করে আছে, তার আত্মকথা কখনো ঐ ঘটনা যোজনার বাইরে যায় না। সুতরাং প্রতিদিনকার তুচ্ছতাকে যে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি, তার পক্ষে সম্ভব নয় আত্মকথার মাধ্যমে জীবনের ব্যাখ্যা করা।

দূরে দাঁড়িয়ে সংসারকে দেখা যায়, মানুষকে দেখা যায়; চেষ্টা করলে অনেকটা অপক্ষপাত বিচারও করা যায়। কোন কর্মবীর, কোন কবি, কোন সমাজসংস্কারক কেমন করে শিশু অবস্থা থেকে জীবনের শেষ সাফল্য বা ব্যর্থতা অর্জন করলেন, বাইরে দাঁড়িয়ে জীবনের নানা ঘটনার সূত্র জুড়ে জুড়ে, জীবনীকার তা সাধারণের কাছে তুলে ধরতে পারেন। তাঁর রোজনামচা, তাঁর পত্রাবলী, তাঁর কথাবার্তা থেকে অনেক অকাট্য প্রমাণ আহরণ করে জীবনীকার তাঁর জীবনের বৃত্তের পরিধি মেপে দেবেন। সেখানে দেখা যাবে কেমন করে সেই একটি মানুষ আপনার চতুর্দিকে আত্মীয়তার বা শত্রুতার জাল বিস্তার করে সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ব্যক্তির যেটা প্রকাশ, সমাজের পট-ভূমিকায় তার যে বিস্তার তাকেই তুলে ধরেন জীবনীকার। এমন ঘটনা নিত্যই ঘটে যে ঐ বিরাট ব্যক্তিত্বের কীর্তির হিসাব সঠিকভাবে রেখেও তাঁর ব্যক্তিত্ব কোন উৎস থেকে উৎসারিত হলো তার কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা জীবনীকার দিতে পারেন নি। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই তা দেওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ যদি জীবনস্মৃতি বা আত্মপরিচয় না লিখে যেতেন তবে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী কবিচিত্তের বিবর্তনের ধারাটিকে অত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতো কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। সুতরাং জীবনীরচনায় জীবনবৃত্তান্তের ব্যাখ্যা আছে কিন্তু জীবনব্যাখ্যার অবকাশ কম।

আত্মজীবনীর মূল কথা হলো সেই জীবনব্যাখ্যা। যে জীবনটি নানা বর্ণে, নানা রসে ফলবান হয়ে ফুটে ওঠে, কোথা থেকে সে রসসংগ্রহ করে, কেমন করে সে নূতন নূতন অনুভূতির আনন্দে দুলে ওঠে, কেমন করে বিশ্বলোকের সঙ্গে তার অন্তরের যোগ তৈরী হয়, এই কথাগুলিই আত্মজীবনীতে স্রষ্টারা লিখে থাকেন। সুতরাং আত্ম-

জীবনীর সবটা বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায়না যেমন বোঝা যায় জীবনীর। বৃত্তান্তের ভার কমিয়ে অন্তর্লোকের যে রহস্যের ব্যাখ্যা স্রষ্টারা করে থাকেন তাকে অনেকটা বুঝে নিতে হয় নিজের বোধ দিয়ে, নিজের অনুভূতি দিয়ে। তাই আত্মজীবনী শুধু ইতিহাস নয়, আত্মজীবনী ঘটনা-পারম্পর্যরক্ষিত ধারাবাহিক জীবনকথা নয়, আত্মজীবনী মানুষের হয়ে ওঠার কাহিনী। প্রথম সূর্যোদয় মানুষ কবে দেখে তা কি কারুর মনে থাকে; রবীন্দ্রজীবনী লিখতে বসে কারুরই সে কথা মনে আসার কথা নয়। নিজের জীবনে কবি একদিন সূর্যোদয় দেখেছিলেন, সেই সূর্যোদয় শুধু নীল আকাশেই হয়নি, হয়েছিল কবির চেতনার জগতে। ভবিষ্যৎ জীবনে সূর্যকে কেন্দ্র করে যত বিচিত্র কল্পনার ঘাত প্রতিঘাত কবির মনে তরঙ্গিত হয়ে উঠেছিল তার প্রথম সূত্র যে ঐখানে তা কবি যদি নিজে বলে না যেতেন তাহলে চিরকাল অজানা থেকে যেতো। তাই চেতনার জাগরণ আর বিকাশই হলো আত্ম-জীবনীর বলবার কথা।

ঘটনার বৈচিত্র্য সব জীবনেই কিছু কিছু থাকে। একই চমকপ্রদ ঘটনা দুটি জীবনে একই ভাবে ঘটছে, এও কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। রাজসভায় দুই কবি সম্মানিত হতে পারেন। তাঁদের জীবনের পরিণতি এক হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়, কিন্তু জীবনের বৃত্তে যে ব্যক্তির কেন্দ্রটি রয়েছে তার বোধ, চেতনা, উপলব্ধি সবই আলাদা হয়। সেইখানেই মানুষে মানুষে পার্থক্য। আর সেইজন্যেই আত্মজীবনীও একই সময়ের দুটি লোকের হাতে আলাদারূপে জন্ম নেয়।

সাহিত্যরচনা করতে বসে সাহিত্যিক তাঁর মনের ভাণ্ডার থেকে বাছাই করে সাহিত্যবস্তু আহরণ করে নেন। যা কিছু জীবনে দেখছেন তাকেই নির্বিচারে সাহিত্যবস্তু করে তোলা যায়না। কারণ জীবনে

হয়ে ওঠার সঙ্গে সব ঘটনার সমান যোগ থাকেনা। যে ঘটনাগুলি মানুষকে জীবনের মূল তাৎপর্যের কথা স্মরণ করায়, বিশেষ করে সেই ঘটনাগুলিই লেখক পাঠকের কাছে তুলে ধরেন। এ কাজ সহজ কাজ নয়। কোন্ ঘটনাগুলিকে বাদ দিলে জীবনের বিকাশের কথাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তা অতি অল্প লোকই বাছাই করে নিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্যসৃষ্টির ভাণ্ডারে তাঁর নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মতো ঘটনাটার উল্লেখমাত্র পাইনা—কবির জীবনে, কবি-মানসের বিকাশ ও পরিণতিতে ঐ ঘটনাটা কবির কাছে একান্ত মূল্যহীন বলে মনে হয়েছিল। সুতরাং সাহিত্যসৃষ্টির একটি বিশেষ কৌশল হল বাছাই করা—আত্মজীবনী লেখকের পক্ষে সহজ কাজ নয়।

নিজের জীবন লিখতে বসার সবচেয়ে বড় বিপদ এই যে নিজের অজান্তেই আত্মপ্রচারের দুর্বলতা মানুষকে পেয়ে বসে। আত্মঘোষণার উদ্দেশ্য না থাকলে আত্মজীবনী লেখার অর্থ নেই, কিন্তু সেই আত্মঘোষণা হলো মানুষের বিশ্বাসের ঘোষণা। কোন বিশেষ আদর্শের জন্য যে মানুষ তার জীবন পণ করে সে মানুষের লেখাতে যখন সেই বিশ্বাসের সুর বেজে ওঠে অসংকোচে, তখন সে লেখা সত্যমূল্য লাভ করে। দেবেন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখায় সেই সুর বেজেছে। আদর্শের প্রতি একান্ত অনুরাগই তাঁদের গ্রন্থকে উচ্চমূল্য দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী-গুলিতে তাঁর কবিত্বশক্তির বিকাশের ধারাটি ফুটিযে তোলা হয়েছে, আত্ম-প্রচারের লেশমাত্র স্পর্শ সেখানে নেই। কিন্তু ঐ আত্মপ্রচারের প্রচেষ্টাতেই মনীষী রাজনারায়ণের আত্মচরিত মহৎ সাহিত্যের মর্যাদা হয়তো পাবে না। ভারসাম্য রক্ষার ক্ষমতা না থাকলে মহৎ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে পারে। নিজের জীবনকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে অতি অল্প লোকই দেখতে জানে বা পারে, নিজের দুর্বলতা গোপন করে লোকের মনের মত করে

নিজেকে ফুটিয়ে তোলার সস্তা প্রচেষ্টাও না হতে পারে তা নয়। যে মানুষের বোধশক্তি আছে তার পক্ষে জীবনের রহস্য অনুসন্ধানও সেই রহস্যকে কেন্দ্র করে সাহিত্যরচনার প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে. কিন্তু সূক্ষ্ম রসবোধের অভাব ঘটলেই সেই জীবনী নিছক আত্ম-কৃতকর্মের প্রশংসার তালিকা হয়ে দাঁড়ায়। আনন্দের কথা হলো এই যে বাংলা আত্মজীবনীর দু-একটি ছাড়া প্রায় সবগুলিতেই স্রষ্টারা নিজেদের চেয়ে নিজেদের জীবনবিশ্বাস ও বিকাশের ধারাটিকেই প্রকাশ করেছেন বেশী। নিজেকে গোপন করা শিল্পীর কাজ। কিন্তু আত্মজীবনীর লেখক নিজেকে প্রকাশ করেন নিজেকে উৎকটভাবে প্রধান না করে তুলেও।

মানুষ মাত্রেরই দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা আছে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়েই অতি সহজে তাকে চেনা যায়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন্ সারাজীবন নানা মিথ্যা ধারণার জঞ্জাল স্তূপ সরিয়ে সরিয়ে সত্যের অনুসন্ধান করেছেন। রোমের বিরাট ইতিহাস লেখার পর নিজের জীবনের সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা করলেন। ঐতিহাসিক যে সত্যসন্ধানের তাড়ায় বাইরের পৃথিবীতে সঙ্গতি খোঁজেন সেই সত্যের তাগিদেই আত্মজীবনকাহিনী লিখতে বসে গিবন্ কোন মিথ্যার আশ্রয় না নেওয়ার প্রতিশ্রুতিকেই বড় করে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন "Truth, naked unblushing truth, the first virtue of more serious history, must be the soul recommendation of this personal narrative." ঠিক ঐ একই কথা বলেছেন রুসো। তাঁর বিচিত্র জীবনে যে সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে সেগুলিকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, এ আশঙ্কা তাঁর ছিল। বুদ্ধির গদা ঘুরিয়ে নয়, অনুভূতির আলোকস্পর্শে তিনি আত্মজীবনী লিখেছেন।

সারাজীবন যে বাধা আর বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে, সেই কথা স্মরণ করে নিজের ভালমন্দ সকল কাজের নিখুঁত ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। সমস্ত সমাজের প্রতি, তাঁর সমালোচকদের প্রতি, একটা তীব্র বিরূপতার ভাব নিয়েই তিনি বলেছেন "I have told the truth. If any one knows anything contrary to what I have recorded, though he proves it a thousand times his knowledge is a lie and an imposture; and if he refuses to investigate and enquire into it during my life time he is no lover of justice or of truth. For my part I publicly and fearlessly declare that anyone who will examine my nature, my character, my morals, my likings, my pleasure and my habits with his own eyes and can still believe me a dishonourable man is a man who deserves to be stifled. সমগ্র জীবনটিকে তার ভালমন্দ, ন্যায় অন্যায় নিয়ে একটি সমগ্র পরিপূর্ণতার রূপে ফুটিয়ে তোলার সার্থক প্রচেষ্টা রুসো করেছিলেন। মনের ভিতরে আর কোন অপরাধবোধ ছিলনা তাঁর, তাই অত উদ্দৃপ্ত ভঙ্গীতে তিনি তাঁর নিজের আত্মসম্মানবোধকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। তাঁর এই ভঙ্গীর মধ্য দিয়েই তাঁকে চেনা যায়, পরিষ্কার বোঝা যায় যে লোকচক্ষে সন্দেহজনক অনেক কিছু তাঁর জীবনে ঘটেছিল বলেই অত জোর করে ঐ সব কথা তাঁকে বলতে হয়েছিল।

নানা উদ্দেশ্যে লোকে আত্মজীবনী লেখে। বন্ধুজনের অনুরোধে, মাসিক পত্রিকার তাগিদ মেটাতে, পুরাণো দিনের কথা স্মরণ করার আনন্দে কিংবা নিছক সাহিত্যরচনার আনন্দেও আত্মজীবনী লেখা হয়েছে।

যে উদ্দেশ্য ও তাগিদে লেখা হয় তার উপরে আত্মজীবনীর চরিত্র নির্ভর করে। বন্ধুজনের অনুরোধ এড়াতে না পেরে বৃদ্ধ অশক্ত অবস্থায় প্রমথ চৌধুরী আত্মকথা লিখেছেন; সে লেখা মন দিয়ে লেখা নয়, সে যেন অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে উপরোধ এড়াতে না পেরে যা হোক কিছু লেখা। সত্যেন্দ্রনাথের 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' মাসিক পত্রের তাগিদ মেটানোর জন্য লেখা, তাই সেখানে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ অতি সুস্পষ্ট, ধারাবাহিকতা নেই, কিন্তু টুকরো টুকরো ছবি সেখানে আশ্চর্যভাবে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। অবনীন্দ্রনাথের 'আপনকথা' শিল্পীর আনন্দের খেয়াল। ছোটবেলার স্মৃতিমঞ্জুষা থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট কয়েকটা ঘটনার ছবি ফুটিয়ে ছোটদের মন ভোলানো। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী একটা সাধনার প্রকাশ, অতি উচ্চগ্রামে তার সুর বাঁধা। ইংরাজীতে এমন অনেক আত্মজীবনী আছে যা রচনার কারণ শুনলে নেহাৎই অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে, যেমন ডারউইন তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন "I have thought that the attempt would amuse me and might possibly interest my children or their children. I have attempted to wri'e the following account of myself as if I were a dead man in another world looking back at my own life. I have taken no pains about my style of writing." ষ্টুয়ার্ট মিলের আত্ম-জীবনী তাঁর উপলব্ধির ধারাবাহিক ইতিহাস। সেখানে ব্যক্তিগত সুখদুঃখ অনুভূতির উচ্ছ্বসিত প্রকাশের সুযোগ কম। উনবিংশ শতাব্দীর মানুষের বুদ্ধি ও চেতনার অগ্রগতির ইতিহাস তাঁর আত্মজীবনী। তাঁর স্ত্রী সম্বন্ধে কয়েকটা পাতা ছাড়া আর হৃদয়োচ্ছ্বাসের স্পর্শমাত্র নেই মিলের লেখায়। দেবেন্দ্রনাথের রচনাও একই রকম, তবে তা মিলের

মত বুদ্ধি ও যুক্তি-সর্বস্ব নয়, গভীর অনুভূতির স্পর্শে তা সঞ্জীবিত। ভগবৎ-উপলব্ধির যে সাধনার ধারাবাহিক ক্রমপরিণতি লেখক দেখিয়েছেন তার মধ্যে অন্য কোন সুখদুঃখের কথা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। তাই যে উদ্দেশ্যে আত্মজীবনী লেখা হয় সেই উদ্দেশ্যই আত্মজীবনীর চরিত্র নির্ধারিত করে দেয়।

যে জীবন মানুষ কাটায়, ক জন তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা পার হয়ে বৃহত্তর জীবনের কী সার্থকতা থাকতে পারে কেই বা তা নিয়ে মাথা ঘামায়। গতানুগতিকতার সীমানা পার হয়ে কেউ যদি কোন অর্থ খুঁজে পায় জীবনের, তবেই তো প্রকাশ করবার প্রেরণা আসে। জৈবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে বেঁচে থাকা মানুষের বেঁচে থাকার অতি সামান্য অংশ মাত্র। নিজের সম্বন্ধে, নিজের জীবন সম্বন্ধে যে মানুষের কোন বোধ জাগে নি তার কাছে প্রতিদিনকার গতানুগতিকতার অতিরিক্ত কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়ে' মানুষের এই অসাড় নিষ্প্রাণ জীবনের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন যে আমাদের আনন্দ দেবার জন্য আমাদের চতুর্দিকে কত রূপের স্রোত চলেছে, কত সূর্যচন্দ্রতারা প্রতি সকালে, প্রতি সন্ধ্যায় উঠছে আর অস্ত যাচ্ছে, কত লক্ষ যোজন দূর থেকে তাদের আলো পৃথিবীতে এসে পড়েছে অথচ আমাদের মনের ভিতর প্রবেশ করছে না। আমাদের মন তার সংগ্রহণী শক্তি হারিয়ে নিষ্প্রাণতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আইনষ্টাইন তাঁর Self-portrait বই-তে বলছেন "Of what is significant in one's own existence one is hardly aware, and it certainly should not bother others, what does a fish know about the water in which he swims all his life." এ কথা ঠিক, খুব অল্প

সংখ্যক লোকই অনুভব করে, খুব কম লোকেরই বোধশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে জীবন সম্বন্ধে। যাঁরা সেই মানসিক উৎকর্ষের অধিকারী তাঁদের সকলের ক্ষমতা থাকে না নিজের কথাগুলো সকলের আকর্ষণীয় করে তোলবার। তারই জন্য জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিমান লোকদের লেখা আত্ম-জীবনীও সময়ে সময়ে সৃষ্টি হিসাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যেতে দেখা গেছে।

নিছক নিজেকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য, পাঠক সাধারণের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠার তার যথেষ্ট কারণ আছে। একটি ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্বের যত মূল্যই থাক না কেন, শুধু নিজের কথা বলে কখনো মানুষের মনে সাড়া তুলতে পারেন না। তাঁর কাজ, তাঁর সাধনা কৌতূহল ও ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু সেই কাজকে ছাড়িয়ে ব্যক্তি যখন আপন অহংবোধকে প্রখরতর করে তোলেন তখনই তাঁর আত্মজীবনী ব্যর্থ হতে বাধ্য, যেমন হয়েছে রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত। তখনকার দিনের বাংলা দেশে মনীষী রাজনারায়ণ বসু এক সর্বজনমান্য পুরুষ। দেশ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হয়নি, তবু রাজনারায়ণের আত্মচরিত পড়লে সচেতন পাঠক অনুভব করবেন যে তাঁর আত্মপ্রসাদ তাঁর সকল কৃতকর্মের গৌরব ছাপিয়ে চলে গেছে। পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বা বিশেষ একটা আদর্শের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে লেখক যখন নিজের জীবনকথাকে একটা ব্যাপ্তি দেন তখনই সেই রচনা পাঠক-সমাজের সমস্ত দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে পারে। প্রমথ চৌধুরীর আত্মকথা অবশ্যই আত্মপ্রচারের দোষে দুষ্ট নয়, তবে লেখক কোথাও একটা সমগ্রতার আভাস দিতে পারেন নি যাতে মনে হতে পারে যে জীবনের প্রবহমান স্রোতের সঙ্গে তাঁর গরমিল নেই। কেমন যেন একটা সংসারছাড়া বিচ্ছিন্নতা তাঁর আত্ম-কথার বিবরণকে বিবর্ণ করে রেখেছে। অন্যদিকে শিবনাথশাস্ত্রীর

'আত্মচরিত' রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি', সৌম্যেন্দ্রনাথের 'যাত্রী' সমসাময়িক জীবনধারার সঙ্গে একটা নিগূঢ় যোগ এবং নিজের ভিতরকার একটা পরিণতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।

যা নেই, যা হতে পারতো তার জন্য মানুষের মনে আক্ষেপের শেষ নেই। অল্প বয়সের দিনগুলো আনন্দে কেটেছে, সে দিন আর ফিরবে না। এই বোধ মানুষের মধ্যে একটা বেদনার সুর বাজিয়ে তোলে। বর্তমানের মূর্তি যখনই রুক্ষ হয়ে দেখা দিয়েছে তখনই যা বিগত বা যা ছিল সম্ভাব্য তার জন্য মানুষের আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। সেই পিছনে ফেলে আসা দিনগুলো তখন কী এক অপূর্ব মাধুর্যে আমাদের স্মৃতির মঞ্জুষা ভরে তোলে। রোমান্টিক মনের ধর্মই তাই। যা দূরের, যা আর পাবার নয় তারই জন্য তার প্রার্থনা। তাই অবনীন্দ্রনাথের 'আপন কথা', 'ঘরোয়া' আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মকথায়, রবীন্দ্রনাথের লেখায়, সৌম্যেন্দ্রনাথের 'যাত্রী'তে এই রোমান্টিক মনের প্রকাশ আমরা দেখেছি। বার বার নানাভাবে যে দিনগুলো জীবনকে একদিন সুধায় ভরিয়ে রেখেছিলো তারা ফিরে ফিরে আসে। সেই মধুর দিনগুলি হারিয়ে যাওয়ার বেদনা সমস্ত রচনাটিকে এমন একটা স্নেহরসে সিঞ্চিত করে যার স্পর্শে পাঠকচিত্তেও সেই বেদনার ছায়া পড়ে। আমাদের বাংলা সাহিত্যে শুধু নয়, পৃথিবীর অনেক বড় বড় আত্মজীবনীতেই এই ভাবটি কোন না কোন আকারে ফুটেছে। রুসোর কনফেশনসের ভূমিকায় জে. এম. কোহেন লিখছেন "The feeling that constantly recurs in the confession is one of a loss, a regret for some other way of life that would have brought Rousseau happiness"

যাঁরা মহাপুরুষ, যাঁরা কর্মী, শিল্পী, তাঁদের হাতেই মানুষের ভাব-জগতের গতি নির্ধারিত হয়। তাঁদের ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা মানুষের ইতিহাসকে অনেকটাই প্রভাবিত করে। ইতিহাসকার বাইরে থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যে ছবি ফুটিয়ে তুলবেন তার যেমন একটা নিরপেক্ষ মূল্য আছে, তেমনি এই সব পরিবর্ত্তনের যাঁরা শিল্পী, যাঁদের বলিষ্ঠ জীবন মানুষের ইতিহাসকে বদলে দেয়, নানা নূতন মূল্যবোধ জাগ্রত করে, তাঁদের অভিজ্ঞতারও একটা মূল্য আছে। বাইরে দাঁড়িয়ে গতিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা এক জিনিষ আর ভিতরের গতিতে ছুটে চলার অভিজ্ঞতা অন্য জিনিষ। দলিল ঘেঁটে ঘটনা উদ্ধার করা যেতে পারে কিন্তু সেই ঘটনার পিছনে কখন কোথায় কি উদ্দেশ্য, কি অনুভূতি কাজ করছে তা জানতে হলে সেই কর্মীদের স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশিত নানা পত্রিকা থেকে ও অন্যান্য কাগজপত্র ঘেঁটে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস রচনা করা যেতে পারে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির আত্মজীবনীতে সমাজস্রষ্টাদের মনের কথাগুলি ধরা আছে। তাঁরাই ঐ সমাজকে রূপ দিয়েছেন, তাঁদের পরিচয়েই ব্রাহ্মসমাজের পরিচয়। তাই তাঁদের জীবন-কথার মধ্যেই ব্রাহ্ম আন্দোলনের মর্মকথাটি লুকানো আছে। আত্মজীবনীর ঐতিহাসিক মূল্য অল্প নয় ঐ কারণেই। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কবিরা যেটুকু আত্মপরিচয় দুচার কথায় অসম্পূর্ণভাবে দিয়ে গেছেন তার থেকেও ঐতিহাসিকেরা নানা তথ্যের সন্ধান পাচ্ছেন। বাংলা আত্মজীবনীকারদের মধ্যে অনেকেরই ঐ বোধ খুব প্রখর যে তাঁরা ব্যক্তিমাত্র নন, তাঁদের মধ্য দিয়ে একটা যুগের নূতন দর্শন প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং তাঁর নিজের জীবন যতটা থাকবে তার চেয়ে অল্প

থাকবে না তাঁর দেশের সমসাময়িক ইতিহাস ও তাঁর আদর্শের কথা। এই বোধ বোধহয় সবচেয়ে প্রখর ছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে। ব্যক্তিজীবনের সুখদুঃখ, ভালোমন্দ, আশা-আনন্দের সঙ্গে ইতিহাসের সূত্রটি নিপুণভাবে জুড়ে দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। মানুষের জীবনকে কেমন করে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড় করাতে হয় তাও তিনি জানতেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মচরিতেও দেখি নিজের জীবনের ও পরিবারের পটভূমিকা তিনি যেমনভাবে এঁকেছেন তা অতি অল্প লোকই পেরেছে। সত্যেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক জ্ঞানের সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনকাহিনীর কোন মিশ্রণ ঘটেনি। ঐতিহাসিক তথ্যমিশ্রণের মাত্রাবোধ থাকলে তা লেখককে অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিকতার অপরাধ থেকেও রক্ষা করে।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে আত্মজীবনী একটা বিশেষ স্তরের মর্যাদা পেয়ে আসছে বহুকাল থেকে। চতুর্থ শতাব্দীতে সেণ্ট অগাষ্টিনের কনফেশনস্ লেখা হয়েছিল। ভারতীয় সাহিত্যে আত্মজীবনীর বিশেষ স্থান ছিল না কোন কালেই। কবি বা শিল্পীরা এতই নিরাসক্ত হতেন যে নিজেদের সম্বন্ধে কোন আত্মপরিচয় দেওয়া তাঁদের কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হতো। ভারতবর্ষের শিল্পী আপন শিল্পসাধনায় সমাহিত, তাই শিল্প-বস্তুকে অতিক্রম করে নিজেকে জানানোর রুচি হতো না তাঁদের। অজন্তার শিল্পীরা নামটুকু পর্যন্ত গোপন করে গেছেন, প্রাচীন বহু কাব্যের কবির নামটুকু ছাড়া আর সবই বিস্মৃতির অতলে চাপা পড়েছে। চরিতকথা যদিও প্রাচীনকালে কিছু কিছু রচিত হয়েছে তবু আত্মজীবনী বা আত্মকথার রেওয়াজ পরবর্তী কালের ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব-জাত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মধ্যযুগের কাব্যগুলিতে যে আত্ম-পরিচিতি দেওয়ার প্রথা রয়েছে তা সেই কাব্যের অংশ হিসাবেই,

তার নিজস্ব কোন মূল্য নেই। যে দেবদেবীর পূজাপ্রচার ছিল আসল উদ্দেশ্য তাদের কৃপাপাত্র যে সে কেমন লোক এই খবরটুকু দিতেই যেন আত্মকথার কিছু আভাস দেওয়া। তা ছাড়া আর কোন গভীরতর উদ্দেশ্য নেই। সেইটুকুর মধ্যে যা পাওয়া যায় তা প্রধানতঃ বংশের গুণকীর্তন, স্থানীয় শাসকের অত্যাচার, রাজার দাক্ষিণ্যলাভ ইত্যাদি। তার ফলে তখনকার ইতিহাস এই সব কবিদের লেখায় কিছু কিছু থেকে গেছে।

বাংলা সাহিত্যে প্রকাশিত আত্মজীবনীগুলির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আত্মজীবনীগুলি অধিকাংশই ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদের লেখা। দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, শিবনাথ শাস্ত্রী এই তিন নেতার রচনাই ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনাগুলির মধ্যে প্রধান। রামমোহন আত্মকথা লেখেন নি, চিঠির মধ্যে নিজের পরিচিতিটুকু মাত্র দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী অসম্পূর্ণ—তা শেষ হলে কি আকার আর রূপ পেতো বলা যায় না, কিন্তু যে অবস্থায় পাওয়া গেছে তা নেহাৎই খণ্ডিত। রাসসুন্দরীর গ্রন্থ সুখপাঠ্য কিন্তু জাতীয় জীবনে তা কোন প্রভাব বিস্তার করেনি কখনো। আজকের পাঠকের কাছে সে কথা অত্যন্ত ঘরোয়া কথার তুচ্ছতায় পরিপূর্ণ বলে অনাদৃত হতে পারে। সুতরাং উল্লেখযোগ্য সম্পূর্ণ গ্রন্থ যা বাকী রইলো তা তিন ব্রাহ্ম নেতার। কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করবার পদ্ধতি তাঁদের কত ভিন্ন। দৃষ্টিভঙ্গীর সেই পার্থক্যের ফলে একই আন্দোলনের বৈচিত্র্য পাঠকের কাছে ধরা পড়লো। সেদিনকার বাংলায় যাঁরা কর্মবীর তাঁরা অনেকেই ব্রাহ্ম। নানা পরিবর্তনের স্রোতে তাঁরা তখন দেশের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। সেদিন অনেক ব্যাপারেই তাঁরা পাশ্চাত্ত্য রীতিনীতি স্বীকার করে নিয়েছিলেন সচেতন বিচার-

বুদ্ধি দিয়ে। নারী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবাবিবাহ সকল ব্যাপারেই তাঁরা অগ্রণী হয়ে আসতেন। তাঁদের বিচারপদ্ধতি ছিল আধুনিক। উপাসনার জন্য হল তৈরী করা মতবাদ প্রচারের জন্য পুস্তিকা ছাপানো, পত্রিকা প্রকাশ করা, ছাপার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য প্রেস কিনে ফেলা, স্কুল প্রতিষ্ঠার মারফতে জনসাধারণকে আকর্ষণ করা— এই সব পদ্ধতি তাঁরা ভালভাবেই বুঝেছিলেন, তাই সেদিন নানা দলাদলি মতবিরোধ সত্ত্বেও অনেক স্মরণীয় কাজ তাঁরা করে গেছেন। যে চেতনা নিয়ে তাঁরা ঐভাবে মতামত প্রচারের কাজে লেগেছিলেন সেই চেতনাতেই তাঁরা আত্মজীবনী লিখেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তুলে ধরলেন সাধন-তত্ত্বের মূল কথাগুলি, রাজনারায়ণ দেখালেন একটি জেলায় ব্রাহ্ম সমাজের কার্যক্রম, শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর সবভারতীয় মন নিয়ে সারা ভারতময় ছুটে বেড়ানোর কাহিনী লিখলেন। তার মধ্য দিয়ে পরিচিত-অপরিচিত সকল মহলে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে ঔৎসুক্য জাগবে এ আশা অতি অবশ্যই তাঁরা পোষণ করতেন। পরবর্তী কালে যে সব রাজনৈতিক নেতা আত্মজীবনী লিখেছেন সেটাও ঐ একই উদ্দেশ্য থেকে। তাঁদের আত্মকথার মধ্য দিয়ে তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ এবং ধ্যানধারণার ছবি ফুটেছে। কেমন করে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, নানা মতামতের সংস্পর্শে এসে শেষ পর্যন্ত জীবনে একটা বিশ্বাসকে স্থিরভাবে আঁকড়ে ধরে জীবনের সর্বস্ব পণ করা যায় তারই কথা রাজনৈতিক আত্মজীবনীতে থাকা উচিত। ঐ উদ্দেশ্য ছিল বলেই ব্রাহ্ম ধর্মের নেতারা তাঁদের আত্মকথাকে ব্রাহ্মসমাজের পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন।

ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর নূতন ব্যক্তি-চেতনা জাগ্রত হলো, অকারণ বিনয়ের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার শক্তি

অর্জিত হলো। 'মুই কোন ছার' মনোবৃত্তির কচুরীপানায় মন আর আটকে রইলো না। ব্যক্তি সত্তার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মপ্রকাশের বাসনা প্রবলতর হতে লাগলো। নানা আদর্শের সংঘাত চলেছে বাঙ্গালীর জীবনে। কত মনান্তর, কত মতান্তর—তবু কত বলিষ্ঠ চরণের পদক্ষেপ বাঙ্গালী দেখেছে তার শেস নাই। এই সংঘাত যত তীব্র হতে লাগলো ততই ঐ সব যোদ্ধারা নিজের অন্তরে অন্তরে আপন একাকিত্ব অনুভব করতে লাগলেন। নিজের কথা অন্যের কাছে বলা যে নিরর্থক নয় সে বোধ এলো। রামমোহনও অল্প কথায় নিজের পরিচয় লিখেছেন। দেবেন্দ্রনাথ তো আত্মজীবনীর পথ-প্রদর্শক।

আদর্শের সংঘাত থেকেই আত্মকথা বলার প্রেরণা। অগষ্টিন ও চেলিনির পর যে আত্মকথা ইউরোপে আলোড়ন এনে দিলে তা হচ্ছে রুসোর আত্মকাহিনী—Confessions. ইউরোপের জীবনে এরকম ঝোড়ো হাওয়ার যুগ বেশী আসে নি। পুরাণো ধারণার ভিত্তিতে আঘাত লাগছে, পুরাণো নৈতিকবোধ ফুটো ফানুসের মত ফেঁসে যাচ্ছে। তার জন্য রুসোর দায়িত্ব অল্প নয়। নিজের জীবনে যত ঘটনা ঘটেছে সেগুলো প্রতিপক্ষকে নানারকম আঘাতের সুযোগ দিয়েছে। সে এক রোমান্টিক মুহূর্তে রুসোর কনফেশনের জন্ম। টলষ্টয়ের আত্মকথা, গান্ধীজীর জীবন গবেষণা, ট্রটস্কীর "মাই লাইফ" সেই বিক্ষুব্ধ প্রবল প্রাণবন্ততার প্রকাশ। যেখানে এমনি কোন বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণে আত্মকথা অনিবার্য-ভাবে লিখিত না হয়ে সাহিত্যিক বিলাসের জন্যেই লেখা হয় সেখানে তার আবেদন যে মনের উপরের স্তরকেই স্পর্শ করে যাবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই দেবেন্দ্রনাথ, শিবনাথের রচনা যেমন করে জীবনের মূলে আঘাত ও আলোড়নের সৃষ্টি করে তেমন করে অন্য আত্মকথায় করে না।

নিজেকে জানবার, "নিজের শৈশবের স্মৃতি থেকে আত্ম-উদ্ধারের যে গভীর প্রচেষ্টায় অবনীন্দ্রনাথের 'আপন কথা' মুগ্ধ করে তার অভাবই প্রমথ চৌধুরীর আত্মকথার পাঠককে হতাশ করে। যে প্রবল মানসিক দ্বন্দ্ব, সংঘাত-জর্জর জীবনের যে নিবিড় অনুভূতি সৌম্যেন্দ্রনাথের 'যাত্রী'কে প্রথম শ্রেণীর আত্মকথার মর্যাদা দেয় তার অভাবই তারাশংকর, সজনী দাস, উপেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য লেখকদের রচনাগুলির আকর্ষণ অগভীর করে তোলে।

ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু সে ব্যতিক্রম একক এবং অনন্য। তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ—তাঁর জীবনস্মৃতির মধ্যে কোথাও কোন বিক্ষোভ নেই, কোন আদর্শের জন্যে সর্বস্বপণের ঘোষণা নেই। তবু বাংলা সাহিত্যে, শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন ইংরাজী সাহিত্যেও আত্মউদ্ঘাটনের এমন বিচিত্র কাহিনী আছে বলে জানা নেই।

বাংলা সাহিত্যের যে সমস্ত আত্মজীবনী এখানে আলোচিত হয়েছে সেগুলি ছাড়া আরও বহু ছোটবড় আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যে আছে। কত মানুষের কত কথা জীবনের নানা বিচিত্র অনুভূতি থেকে উৎসারিত হয়েছে। সেই সব আত্মকথার আলোচনা নানা কারণে সম্ভব হয়নি। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের রচনা একটি আছে—বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা'। লেখা জোরালো, চিত্তাকর্ষক। শিল্পীদের মধ্যে অসিত হালদারের সাবেকী কথা' সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। প্রবীণ সাংবাদিক ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতা মৃণাল-কান্তি বসুর 'স্মৃতিকথা' অজস্র তথ্য সম্বলিত, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের কাজে লাগবে। বিধুভূষণের 'স্মৃতিকথা' জীবনে প্রতিষ্ঠাকামী যুবকের নিরন্তর সংঘাতের ছবি। নানা আকারে আরও বহু লোকের লেখা আত্মকাহিনী বাংলায় আছে। সুভাষচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মকথা মূলতঃ

ইংরাজীতে লেখা। বিপ্লবী বারীন ঘোষের রচনা নিষ্ঠুর সত্যভাষণে উদ্দীপ্ত, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি', অবনীন্দ্র-নাথের 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', কৃষ্ণকুমারের 'আত্মকাহিনী' তাঁদের মুখে বলা, অন্যের লেখা। নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' বোধহয় আকারে বৃহত্তম।

ছোটখাটো টুকরো টুকরো স্মৃতিকথা নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী আরও ভাল ভাল লেখা হবে বাংলায়, এ আশার মধ্যে অসংগতি নেই।



প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তিনটি আত্মবিবরণী

পুরানো বাংলা কাব্যে আত্মপরিচয় দেওয়ার একটা রেওয়াজ ছিল। কাব্যের উৎপত্তির কারণ বা দেব-দেবীর আশীর্বাদ উপলক্ষেই এই অংশগুলি রচিত হতো—তাই এগুলিকে আত্মবিবরণী ছাড়া বেশী কিছু বলা যায় না। সব কবিই যে আত্মবিবরণী দিয়েছেন তা নয়। যাওবা দিয়েছেন তাও অনেকটাই অসম্পূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় যেখানে কাব্য লেখা হয়েছে সেখানে রাজা ও দরবার কিছু অংশ জুড়ে বসে। এই আত্মপরিচয়গুলির মধ্যে সমাজের দুঃখ দুর্দশার প্রতিফলন চোখে পড়ে। এ গুলোকে বাংলা আত্মজীবনীর প্রথম ক্ষীণ সূত্র বলে মনে করা ভুল হবে না. যদিও এই আত্মবিবরণ-গুলি কাব্যের বিরাট দেহের অংশ বিশেষ। তবে এও ঠিক যে পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী যাঁরা লিখেছেন তাঁরা কেউ-ই এই কাব্যাংশগুলির দ্বারা উৎসাহিত হননি। ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে আমাদের দৃষ্টি সাহিত্যের এই অনাদৃত অংশটির উপরে আকৃষ্ট হয়েছে একথা মনে করলে ভুল হবে না। প্রাচীন কবিরা তাঁদের আত্মবিবরণীর যে পৃথক কোন মূল্য আছে মনে করতেন তাও মনে হয় না।

এখানে বাংলার তিনজন প্রাচীন কবির আত্মপরিচয় অংশ অতি সংক্ষেপে আলোচনা করছি। কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়ের পাঠ বিভিন্ন পুথিতে বিভিন্ন রকম আছে। কবি নিজের সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর দিয়েছেন। ভাষা কবিত্বমণ্ডিত সে কথা বলাই বাহুল্য, তিন চার শতাব্দী এই ভাষাই মানুষকে মুগ্ধ করেছে। অবশ্য অনেকাংশ প্রক্ষিপ্ত বলে

সমালোচকেরা সন্দেহ করেছেন। এই আত্মবিবরণে পাওয়া যাচ্ছে—প্রপিতামহ নারসিংহ ওঝা "বেদানুজ মহারাজে"র সভাসদ ছিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায় বাস করতে সুরু করেন, সেই ফুলিযা সম্বন্ধে কবি বলছেন—

"গ্রামরত্ন ফুলিযা যে জগতে বাখানি
দক্ষিণ পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী।"

নারসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর। তাঁর পুত্র মুরারিই কৃত্তিবাসের পিতা। মা ভাই বোনদের সম্বন্ধে কবি বলছেন—

"মাতা পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি
ছয সহোদর হইল এক যে ভগিনী।"

পূর্ববাংলা থেকে শিক্ষালাভ করে ঘরে ফিরলেন কৃত্তিবাস—

"সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার কলেবর
নানা ছন্দে নানা ভাষ বিদ্যার প্রসর।
আকাশবাণী হইল সাক্ষাৎ সরস্বতী
তাঁহার প্রসাদে কণ্ঠে বৈসেন ভারথি।"

গৌড়েশ্বরের দরবারের যে বর্ণনা আমরা পাই তা কবিত্বপূর্ণ। রাজার সামনে গিয়ে শ্লোক পড়লেন, তার বর্ণনাটি সুন্দর—

"পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে
সরস্বতী প্রসাদে আমার মুখে শ্লোক সরে।
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়।
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল
খুসি হৈয়া মহারাজা দিল পুষ্পমাল।"

রাজা দান করতে চান, কিন্তু কৃত্তিবাস কবিযশঃপ্রার্থী। তিনি বলেন—

“ধন আজ্ঞা কৈলে রাজা ধন নাঞি লই
যথা যথা যাই আমি গৌরব সে চাহী।
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে।”

বাংলা সাহিত্যের সেই আদিযুগে উপরোক্ত অংশগুলির সৃষ্টি যে কবির উচ্চস্তরের কবিত্বশক্তির পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য উপরোক্ত পাঠ ছাড়া অন্যান্য পুথিতে অন্য পাঠও আছে। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে’, নগেন বসু ও দীনেশ সেন মহাশয়-উক্ত হারাধন দত্তের পুথি ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী ব্যবহৃত পুথির যে মিলিতপাঠ দিয়েছেন তা থেকেই এ অংশগুলি গ্রহণ করা হয়েছে।

কৃত্তিবাসের সময়কাল আজও সঠিক নির্ধারিত হয়নি। তাঁর গৌড়েশ্বর যে কে—সে তর্কও অমীমাংসিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে ষোড়শ শতাব্দী শেষার্ধ পর্যন্ত তাঁর কালের হিসাব আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাঁর আত্মবিবরণী অসম্পূর্ণ হলেও কবির পরিচয় কিছু কিছু বহন করে। তাঁর লেখায় মুকুন্দরামের মতো সমাজ জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। রূপরামের মত নিজের জীবনে তাঁর কোন নাটকীয় উপাদান ছিল না। জন্ম, পিতা মাতার পরিচয় ইত্যাদির পর শিক্ষার প্রসঙ্গ অল্প স্পর্শ করেই দরবারের কথায় এসে পড়েছেন। রাজার প্রসন্নদৃষ্টি-লাভ কবির কাম্য ছিল। কিন্তু রাজবন্দনা রয়েছে অথচ রাজার নাম নেই, এতেই সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে রচনা সর্বাংশে অকৃত্রিম কিনা।

মুকুন্দরাম মধ্যযুগের বাঙালী কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একথা নিয়ে

আজ আর বোধ হয় বিশেষ তর্ক উঠবে না। তাঁকে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে গ্রাম্য বলে বাতিল করে দেওয়ার অপচেষ্টা আমরা দেখেছি। গ্রামপ্রাণ বাংলা দেশের মধ্যযুগের কবির মধ্যে বিংশ শতাব্দীর শহুরে পালিশ না খুঁজে পাওয়া গেলে সে দোষ কবির নয়, সে দোষ আমাদের বিচারবুদ্ধিহীনতার। মুকুন্দরামের বাস্তববোধ আমাদের বিস্মিত করে। তাঁর কাব্যের মধ্যে তখনকার সমাজ, তখনকার জীবন আশ্চর্য প্রাণরস-সিঞ্চিত হয়ে রূপলাভ করে। তাই তাঁর আত্মবিবরণী তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে।

মুকুন্দরামের অনেক পুথিতেই আত্মবিবরণের একটি পদ আছে। সুকুমার সেন মহাশয় আর একটি পদের সন্ধান দিয়েছেন, তা মুকুন্দরামের বাসগ্রাম দামুন্যায় প্রাপ্ত পুথিতে আছে, আর আছে বর্ধমান সাহিত্য সভার পুথিতে। এই পদটি অপেক্ষাকৃত ছোট, তাতে পারিপার্শ্বিকেরও অল্প বিবরণ আছে।

এই পদেই বর্ধিষ্ণু দামুন্যা গ্রামের পরিচয় আছে। শিব অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই গ্রামে। তাঁরই প্রসাদে কবির কবিত্ব—

গঙ্গাসম নিরমল তোমার চরণজল
পান কৈলা শিশুকাল হৈতে
সেই পুণ্যের ফলে কবি হইয়া শিশুকালে
রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে।

এই পদটিতেই তাঁর বংশের কথাও আছে। দ্বিতীয় বৃহত্তর পদটিতে তাঁর সংঘাতবহুল জীবনের কথা কবি বলেছেন। এই বর্ণনা যেমন বাস্তব তেমনি প্রাণস্পর্শী। আজকের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের মতই কবির অবস্থা সেদিন। শাসকের অত্যাচারে প্রজার প্রাণান্ত, কবি সপরিবারে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন।—সেই অত্যাচারের জীবন্ত চিত্র মুকুন্দরামের

লেখনীতে ধরা পড়েছে; তখনকার বাংলার ইতিহাস রাজনৈতিক দুর্যোগের ঘনমেঘাবৃত; মুকুন্দরাম বলছেন (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ)—

'সরকার হইল কাল খিল ভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥
ডিহিদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইল বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে॥
পেয়াদা সবার কাছে প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা॥"

টাকার দ্রব্য যখন দশ আনা, পেয়াদা যখন দুয়ারে হানা দেয় তখন কবি দামুন্যা ছেড়ে গেলেন। রূপরায় ভেড়িয়া গ্রামে তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করলেন, কিন্তু আশ্রয়দাতা হলেন যদুকুণ্ডু—

"দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা।"

তারপর আবার পথচলা সুরু হলো। সম্বলহীন পথযাত্রায় দারিদ্র্যের পেষণ শিশুর ক্রন্দনে প্রকাশ পায়—

"তৈল বিনা কৈল স্নান করিলুঁ উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।"

সেইখানে সেই অসহায় দৈন্যগ্রস্ত অবস্থায় কবি চণ্ডীর দেখা পেলেন—

"ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
হাতে লইয়া পত্রমসী আপনি কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখন কবিত্ব।
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য॥
দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।"

তারপর আবার পথচলে কবি গেলেন আরড়ায় সেখানে ব্রাহ্মণ নরপতি

"সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
শিশুপাছে কৈল নিয়োজিত।"

মুকুন্দরামের এই আত্মবিবরণ নানা দিক থেকে বিশেষভাবে প্রশংসার দাবী রাখে। আঘাত অল্প আসেনি, কিন্তু কবি সেই আঘাতকেই কোথাও চরম বলে মনে করেন নি। রূপরায় যেমন বিত্ত হরণ করেছে যদুকুণ্ডু তেমনি আশ্রয় দিয়েছে। একই সঙ্গে বঞ্চনা ও সমবেদনা তাঁকে ভারসাম্য রক্ষা করতে শিখিয়েছে। তাঁর আত্মবিবরণীর মধ্যে দারিদ্র্য-জনিত ক্ষোভ যে প্রবল হয়ে ওঠে নি তার একটা কারণ আছে। কবি এই সব ঘটনার বহু পরে কাব্য লিখেছিলেন। রাজ-অনুগ্রহপুষ্ট মুকুন্দরাম দুঃখের দিনের দেবীর আদেশের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। তাই রাজসভাসদ মুকুন্দরাম যখন দূর থেকে অতীত দিনের অপহৃত-বিত্ত মুকুন্দরামের কথা স্মরণ করে লিখেছেন তখন স্বভাবতঃই ভাষা বিদ্রূপাত্মক তীক্ষ্ণতায় খড়্গাধার হয়ে ওঠেনি। পরবর্তী জীবনের প্রশান্তি অতীতের দুঃখবর্ণনার মধ্যে ক্ষোভের কালো মেঘ সঞ্চিত

হতে দেয়নি। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর সঙ্গে মুকুন্দরামের আত্মপরিচয়ের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে নিজের বাইরে কৃত্তিবাসের দৃষ্টি যায়নি। সমাজের পটভূমিকায় নিজের কথা কৃত্তিবাস বলেন নি। ফলে সে কাহিনী ভাষার লালিত্য সত্ত্বেও শুধু কয়েকটি নামের সমন্বয়ে পরিণত হয়েছে। মুকুন্দরামের আত্মপরিচয়ের মত প্রাণের স্পর্শ তাতে নেই।

রূপরামের আত্মজীবনীতে ব্যক্তিজীবনের সুখদুঃখ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে ফুটেছে। বাস্তব ঘটনাগুলি তাঁর অপূর্ব কবিত্বের স্পর্শ পেয়ে চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। পথের ধারে পলাশনের বিলের কাছে ঘুরে বেড়ানোর যে বর্ণনা তা সংক্ষিপ্ত এবং সুন্দর--

"ঘুরে ঘুরে বুলি শুধু পলাশনের বিলে।
দুটা শঙ্খচিল উড়ে বিষ্ণু-পদতলে॥"

গুরুর বর্ণনাটিও সুন্দর--"শ্যামল উজ্জ্বল তনু পরম সুন্দর।" রূপরামের বর্ণনার বৈশিষ্ট্যই হলো এই যে তা সর্বদাই সংযত এবং কবি হৃদয়ের আবেগ-স্পন্দন সেই স্বল্প প্রকাশের মধ্যেই অনুভব করা যায়। মুকুন্দ-রামের মত সমাজের পটভূমিকায় তিনি নিজেকে স্থাপন করেন নি। কিন্তু তাঁর ঘরোয়া জীবনের মধ্যে যে নাটকীয় উপাদান ছিল তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করেছেন। বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য, অন্য গ্রামে গুরুর কাছে অধ্যয়ন, তারপর গুরুর আদেশে নবদ্বীপ যাত্রা; পথে মায়ের কথা মনে পড়া, ধর্মঠাকুরের দেখা পাওয়া—সবই নাটকীয় উপাদানে ভরা। অল্পবয়সের বালক দাদার অত্যাচারে একবস্ত্রে চলে যাচ্ছে ঘর ছেড়ে, প্রতিবেশীরা অভিমানী বালককে কড়ি এবং ধুতি দিচ্ছে, সে বর্ণনার মধ্য দিয়ে ক্ষুব্ধ অসহায় বালকের অন্তর্বেদনা আমাদের মনেও ধ্বনিত হয়ে ওঠে—

"খুঙ্গি পুথি লয়ে আমি করিলাম গমন।
রাজারাম রায় দিল কড়ি বার পণ॥
খুঙ্গি নিল পুথি নিল বস্ত্র নাই গায়।
তসবের ধুতি দিল মণিরাম রায়॥"

বেদনার্ত বালকের অভিমানাহত সজল চাহনি এই বর্ণনার পর আমরা কল্পনা করে নিতে পারি। গুরুর কাছে কিছুদিন কাটলো, গুরু "বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে।" তারপরে সেখান থেকে একদিন নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে বেরুলেন "হেনবেলা জননী পড়িয়া গেল মনে।" জননীর জন্য বালকের আকুলতা থাকা স্বাভাবিক। পথে ধর্মঠাকুর দেখা দিলেন, আশ্বাস দিলেন আর বল্লেন

"আজ হইতে রূপরাম আমার গাও গীত
পরিণামে পাবে বড় মনের পিরীত।"

তারপর আবার ঘরের দিকে চল্লেন, ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে দেখা হবে মায়ের চরণে জানাবেন প্রণাম। গৃহাভিমুখী বালকের মন পুনর্মিলনের আশার আনন্দে চঞ্চল।

"সন্ধ্যাকালে আচম্বিতে ঘরে দরশন।
প্রণাম করিব গিয়া মায়ের চরণ॥
সোনা হীরা দুটি বনি দুয়ারে বসিয়া।
রূপরাম দাদা আইল খুঙ্গি পুথি লৈয়া॥"

কিন্তু সেই সময়ে এলেন দাদা রত্নেশ্বর। সুদীর্ঘ পথ যে আশা সম্বল করে চলেছেন, মনে মনে মা ও বোনেদের সঙ্গে দেখা হওয়ার যে ছবি এঁকেছেন সব এক মুহূর্তে তছনছ হয়ে গেল। ঘটনার এই নাটকীয়তা অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়েছেন রূপরাম। যে করুণ পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তার বেদনা বিধুর চিত্রটি আরও নিবিড়তর ব্যথার প্রলেপ

মাখিয়ে দেয় পাঠকের মনে যখন কবি বলেন যে দুটি বোন ভাইয়ের ফিরে চলে যাওয়া দেখলো, কিন্তু বড় ভাইয়ের ভয়ে কিছুই বলতে পারলো না মায়ের কাছে—

"সোনা হীরা দুটি বনি আছিল দুয়ারে।
জননীকে বারতা বলিতে নাঞী পারে॥"

আবার ফিরে যান ঘর থেকে বিষণ্ণ মনে। সুখদুঃখ হাতে হাত ধরে চলে। জীবনের ভালমন্দ একই সঙ্গে আসে। তিনদিন উপবাসে থেকে শানিঘাট গ্রামে পৌছানোর পর

"ঠাকুরদাস পাল তায় বড ভাগ্যবান।
না বালতে ভিক্ষা দিল আড়াই সের ধান॥"

সেই আড়াই সের ধানে কিছু চিঁড়া ভাজা কিনলেন। স্নান সেবে খাবেন, কিন্তু "আচম্বিতে চিঁড়া ভাজা উড়াইল বাতাসে।" এমনি করে অবসন্ন হয়ে চললেন, দিগনগরে তাঁতিদের ঘরে "চিঁড়া দধির ঘটা দেখি আনন্দিত মন।" অবশেষে গোয়ালাভুমের রাজা গণেশরায়ের কাছে আশ্রয় মিললো। সেই বাজাকে ধর্মঠাকুর স্বপ্নে দেখা দিয়ে বল্লেন রূপরামকে দিয়ে কাব্য লেখাতে।

রূপরামের এই আত্মবিবরণী আশ্চর্য মানবিকতার রসে পূর্ণ। তাঁর সমস্ত জীবন ছবির মতন ভেসে ওঠে আমাদের মনের পটে। সমস্ত ঘটনা সত্য নাও হতে পারে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে নিজের জীবনকে কবি এমনভাবে ফুটিয়েছেন যা আমাদের ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে এবং নাটকীয় ঘটনা সংস্থানে আমাদের মুগ্ধ করে।

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী

একটি পরিবার একটি জাতিকে কত দিতে পারে তা বোধহয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস না জানলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। বাঙালী জাতির নবজাগরণের দিনে, ভারতবর্ষের আত্ম-উদ্বোধনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে, এই একটি পরিবার কি অমিত বীর্য আর সৃষ্টিক্ষমতা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতির প্রাঙ্গণে, তা কারুর অজানা নেই। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী গতানুগতিক জমিদারীর পথ ধরে ঐশ্বর্য অর্জন করা ছাড়াও অর্থ উপার্জনের অন্যতর পন্থা আবিষ্কার করলো; সেই নূতনতর পথসন্ধানের পুরোযাত্রিক প্রিন্স দ্বারকানাথ। কুৎসিত বীভৎস কুসংস্কারের জাল ছিঁড়ে জাতির জীবনে মুক্ত উদার চিন্তার স্রোত নিয়ে এলেন রাজা রামমোহন, তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে এলেন দ্বারকানাথ। অভিজাত পরিবার হিসাবে ঠাকুর-পরিবার আগে থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বারকানাথের মহত্ত্ব, ঔদার্য আর সাহস সেই আভিজাত্যের সঙ্গে নবজাগ্রত চিন্তাধারার যোগ সাধন করলো। এলেন দেবেন্দ্রনাথ—উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সেই বিগতস্পৃহ ধর্মনেতা যিনি ধর্ম আর আনন্দকে নিজের হৃদয়ের মধ্যে একসূত্রে বেঁধে নিলেন। পুঁথিগত ধর্ম তাঁর মনকে রক্তচক্ষুর শাসনে বাঁধতে পারেনি। কোন ধর্ম গ্রন্থকেই তিনি চরম বলে মনে করেন নি। সংসারপলায়িত বিজনবাসের যে আত্মনিগ্রহ কঠিন তপস্যার নামে যুগে যুগে শ্রদ্ধা পাচ্ছে ভারতবাসীর কাছে দেবেন্দ্রনাথ কখনো সেই যান্ত্রিক বৈরাগ্যের পথকে ধর্মের পথ বলে মেনে নেন নি। তাই সেদিন নিজে

হাতে নূতন করে ব্রাহ্মসমাজ তৈরী করলেন, ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ লিখলেন. ধর্মসাধনায় যুগান্তর আনলেন। শুধু নবযুগ যে ধর্মের ক্ষেত্রেই আনলেন তাই নয়, বাংলা সাহিত্যও তাঁর কাছে অল্প ঋণী নয়। তাঁর পরবর্তী-কালে যে সব স্রষ্টাদের আবির্ভাব হলো, জাতির চেহারা বদল হয়ে গেল তাঁদের হাতে ; দার্শনিকপ্রবর দ্বিজেন্দ্রনাথ, সাহিত্যসাধক জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ, সঙ্গীতভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ, শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ আর সবচেয়ে বেশী করে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর শিক্ষায় সংস্কৃতিতে রুচিতে আমূল পরিবর্তন এনে দিলেন।

অন্যান্য বিষয়ে যেমন, সাহিত্যে আমাদের এই আলোচ্য শাখাটিতেও ঠাকুর-পরিবারের অবদান যে কতখানি তা বলে শেষ করা যায় না। সুদীর্ঘ চার পুরুষ ধরে এই পরিবারের স্রষ্টারা বাংলাসাহিত্যে আত্মজীবনী রচনা করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক আত্মজীবনী, তাঁর পুত্রদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের 'বোম্বাইপ্রবাস', রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা', তাঁদের পরবর্তীদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের 'আপন কথা', 'ঘরোয়া', জোড়াসাঁকোর ধারে' বাংলা ভাষার অপূর্ব সম্পদ। অবনীন্দ্রনাথের পরবর্তীদের মধ্যে সৌম্যেন্দ্রনাথের 'যাত্রী' এই চার পুরুষের সাধনার একটি ধারাকে সম্পূর্ণ করে।

এই ধারার প্রথম প্রবর্তক দেবেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক আত্মজীবনী। জীবন যে সন তারিখের পারম্পর্য নয়, তা যে কতকগুলো ঘটনার শুধু সমাবেশই নয়—একথা দেবেন্দ্রনাথ জানতেন। তাই তাঁর জীবনী আর আত্মজীবনী এক নয়। জীবনীকারের কাজ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ইতিহাস রচনা, আর আত্ম-

জীবনী লেখকের কাজ ব্যক্তির ভিতরকার অনুভূতি আর উপলব্ধির ছবি ফুটিয়ে জীবনকে প্রকাশ করা। স্রষ্টার কাছে জীবনের মামুলি খবরগুলো অতি তুচ্ছ, যেগুলো জীবনীকার আদর করে সংগ্রহ করেন। স্রষ্টা জীবনকে দেখেন বীণার মত, যে বীণাতে কোন গভীর উপলব্ধির সুর বেজে ওঠে। সেই সুরটি যতক্ষণ না বাজে, ততক্ষণ এই জীবনটার কোন সার্থকতা নেই। তাই কেমন করে জীবনের বীণার সুর বাজে, কেমন করে জীবন কোন বৃহৎ সাধনার লীলাভূমি হয়ে ওঠে, সেই গোপন সত্যটিকে প্রকাশ করাই হলো আত্মজীবনী-রচয়িতার প্রেরণা ও আনন্দ।

আত্মপ্রচারের জন্য নয়, নিজের বিশ্বাস সবসাধারণের কাছে প্রচারের জন্য দেবেন্দ্রনাথ বোধহয় এই আত্মজীবনী লিখেছিলেন। কিন্তু পাছে এই আত্মজীবনী তাঁর প্রতিদিনকার জীবনযাত্রায় ব্যস্ত অহংপুরুষের প্রচ্ছন্ন গৌরববোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, বোধহয় সেইজন্যেই তিনি গ্রন্থ-স্বত্বাধিকার দানপত্রে লিখেছিলেন, "আমি এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবে না।" নিজেকে চিরদিনই তিনি একটু আড়ালে আড়ালে রাখতে চেয়েছেন, তাঁর জীবনে ঢাকঢোল পিটিয়ে আত্মঘোষণার রুচিবিকৃতি কখনো দেখা দেয়নি। হতে পারে তিনি জীবিত থাকতে এই গ্রন্থ পাছে কেউ আত্মপ্রচার বলে মনে করে তাই তিনি প্রকাশ করতে চাননি।

অমিত ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। সেদিনকার বাংলাদেশের সমাজে দ্বারকানাথের বৈভবপ্রাচুর্য কারুর অবিদিত ছিল না। নানা ধনী ও গুণীলোকের আগমনে সেদিন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী সর্বদাই সচকিত। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেই চঞ্চল জীবনস্রোতের মধ্যেও দূরে দূরে চলেছেন। তখনই তাঁর ভিতরে ঈশ্বর-উপলব্ধির দারুণ

তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠেছে। দ্বারকানাথের দৃষ্টি এড়ায় নি তা। তবুও দেবেন্দ্রনাথ নিজের অন্তরের পিপাসা নিয়ে সেই অমৃততীর্থের সন্ধানে ছুটেছেন, যেখানে না পৌছানো পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই, বিরাম নেই। তাই সেই ধর্মসাধনার কথাতেই আত্মজীবনী ভরে যায়; পাঠক লক্ষ্য করে ভগবৎ-উপলব্ধির কি গভীর আকুতি নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীর প্রতিটি কথা বলেছেন। সংসারে যতটুকু পাওয়া গেল মন তাতে তৃপ্ত নয়। একটা অতৃপ্তি, একটা গভীর নিরাসক্তি কেবলই বৃহত্তর সাধনার বেগ জুগিয়ে চলেছে। এই বৃহৎকে জানার আকাঙ্ক্ষা কোথা থেকে এলো, কেমন করে মন ধীরে ধীরে নানা স্তর পেরিয়ে সেই পরমপুরুষের কাছে পৌছে গেল, ভরলো অপার আনন্দে, তারই কথা দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন।

যতখানি নিখুঁত হয়ে অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর জীবনী লিখেছেন, জীবনের বিচিত্র ঘটনার সূত্র রক্ষা করে সাজিয়েছেন, ঘটনার প্রতি ঠিক যেন ততটাই ঔদাসীন্য নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কথা লিখেছেন। অজিতকুমারের জীবনচরিত আর দেবেন্দ্রনাথের আত্ম-জীবনী পাশাপাশি রেখে পড়লে সহজেই বোঝা যায় একই মানুষের জীবন বাইরে থেকে দেখলে আর ভিতর থেকে দেখলে কত পার্থক্য তাদের। আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মভাব-বিভোর মন নিয়ে সংসারের আর সব ঘটনাকে অনাবশ্যক মনে করেছেন—অনাবশ্যক এই দিক থেকে যে তাঁর জীবনের চরম সার্থকতা যে ধর্মবোধে, সেই বোধের বিকাশ ও পরিণতির সঙ্গে সে সব ঘটনার যোগ নেই।

ছোট ছোট সংস্কার আর সংকীর্ণতার বেড়া তুলে সনাতন হিন্দু-ধর্মের কায়েমী-স্বার্থ সমাজপতিরা দেশের জীবনের মুক্ত স্রোত অবরুদ্ধ করে ফেলেছিল। বাংলা দেশের সে এক ঘোরতর দুর্যোগের দিন।

কোন নূতন চিন্তা, কোন নূতন সৃষ্টি, কোন নূতন উপলব্ধি সেদিন জাতির মানসলোকে স্থান ক'রে নিতে পার্চ্ছে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কৃষ্ণনগরের রাজসভা বাংলার সংস্কৃতির এক কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ালো। ক্ষয়িষ্ণু রাজতন্ত্রের আসন্ন অবলুপ্তির চিহ্ন চারদিকে। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাই সেই চিহ্ন প্রকট করেছে তার আপাত দৃষ্টিবিভ্রমী জৌলুষের মধ্যে। নবদ্বীপের বৈষ্ণব সাধকরা তাঁর রাজসভায় স্থান পাননি, কিন্তু বিস্তৃত আসন ছিল আদিরসের কবি ভারতচন্দ্রের আর গোপাল ভাঁড়ের। সেই কৃষ্ণচন্দ্রীয় রাজসভার প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বাংলার জীবনে অনেক দিন ধরে চলেছিল। রাজা রামমোহনই হলেন প্রথম পুরুষ যিনি দেশের এই দুর্দিনে এই অধোগতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন নি। জীবনের চতুর্দিকে দড়িদড়া এঁটে বিনাশ-আশঙ্কিত সমাজপতিরা পাশ্চাত্যদেশের সকল আলোকের পথ রুদ্ধ করেছিলেন। রামমোহন জীবনের দ্বার মুক্ত করলেন, অচলায়তনের প্রাকার ভেঙ্গে বাইরের আলোয় নিজেদের যাচিয়ে নেবার সুযোগ এনে দিলেন। বাঙ্গালীর জীবনে ব্যক্তিচেতনার বোধ জাগিয়ে তুললেন। সেই চেতনার আলোয় আরও অনেক প্রদীপ জ্বলে উঠলো। জীবনের নানা ক্ষেত্রে উদারতর দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যেতে লাগলো। নূতন মূল্যবোধের সন্ধানে বাঙ্গালীর মনীষা উৎসাহিত হয়ে উঠলো। আত্মানুসন্ধানের পথ ধরেই নানা স্রষ্টার আবির্ভাব হতে লাগলো, আবির্ভাব হলো নানা কর্মবীরের। যা বিগত, যা অতীতকালের, তাকে শুধু প্রাচীন বলেই সম্মান দেওয়া গেলনা আর। হিন্দুধর্মের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথ তিনি নিজেই সূচনা করে দিয়ে গেলেন। পৌত্তলিকতা বাতিল করে একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি সাধ্যমতে সব চেষ্টাই করেছিলেন।

সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল তাঁর। সামাজিক অন্যায়কে তিনি প্রশ্রয় দেন নি দেশসেবার নামে, কুসংস্কারকে শ্রদ্ধা জানাননি ধর্মপ্রাণতার নামে, যা নূতন তাকে শুধু বিদেশাগত বলেই সরিয়ে দেননি। তাঁর পরে আরও নানা মনীষা এলেন যাঁরা নূতন নূতন চিন্তা, ভাবনা দিয়ে জীবনের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির জড়তা কাটিয়ে তুললেন। ব্রহ্মোপলব্ধির যে মন্ত্র রামমোহন বাঙ্গালীর জীবনে এনে দিলেন সেই মন্ত্রকে সর্বজনের করে তোলার কঠিন কাজ, গুরু দায়িত্ব নিজের উপর তুলে নিলেন দেবেন্দ্রনাথ। পুতুল-পূজোর ধারণা থেকে মানুষের মনকে এবং ঈশ্বরের ধারণাকে মুক্ত করার বীজমন্ত্রটি রামমোহনের পরেই দেবেন্দ্রনাথের পরিচর্যায় লালিত হয়ে কালে ব্রাহ্মধর্মের বনস্পতিতে পরিণত হলো। ধর্ম তাঁর কাছে প্রাচীন পুরাণকাব্যের অনুশাসনমাত্রই হয়ে দাঁড়ালো না। তাঁর ধর্ম-জীবনের এই কাহিনী শুধু তাঁরই কাহিনী নয়, এ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের জন্মের কাহিনী। উনবিংশ শতাব্দীর জাগ্রত বাংলাদেশের নূতনতর আত্মসন্ধানের কাহিনী।

রবীন্দ্রনাথ 'রসের ধর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন শুধু ভাবের সাধনা নয়, শুধু কর্মের সাধনা নয়, ঐ দুয়ের মিশ্রণেই জীবনের সত্যকার সার্থকতা। আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় যাঁরা কর্মযোগী তাঁরা সেই কর্মের স্রোতে, সেই কর্তব্যবোধের কঠিনতায় এমন ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন যে সেই কাজের অভ্যাসের বাইরে তাঁদের জীবন দিনে দিনে সংকীর্ণ হয়ে আসে। আর যাঁরা রসসাধনা করেন তাঁদের পদে পদে রসস্রোতে বেসামাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই দুই সাধনার যাঁরা সমন্বয় করতে পারেন তাঁরাই জীবনসাধক। দেবেন্দ্রনাথ সেই সাধক রসযোগ আর কর্মযোগের সঙ্গমে জীবন যাঁর পরিপূর্ণ। তাঁর আত্মজীবনীতে পাতায় পাতায় আমরা দেখবো কেমন করে

তাঁর মন, তাঁর ধর্মবিশ্বাস অকারণ বৈরাগ্যের কঠিনতার ছলনাকে কাটিয়ে উঠে বাইরের প্রকৃতি আর পৃথিবীর নানা বিচিত্রতাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। জীবনে কোন সৌন্দর্যকে কোন গোঁড়া মনোভাব নিয়ে তিনি অবহেলা করেন নি। সূর্যোদয়ের রূপ দেখেছেন প্রাণভরে, দেখেছেন কুতুবমিনার থেকে বিরাট বিস্তৃত দিগন্ত, দেখেছেন পর্বতদেশে পার্বত্য বনরাজীর লীলা, মন খুসী হয়েছে, আনন্দে ভরে উঠেছে। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি' যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন হয়নি তার মূল কারণ সেই মহর্ষির শিক্ষা যিনি সকাল-সন্ধ্যা গায়ত্রীমন্ত্রের দীক্ষা দিয়েছিলেন পুত্রকে। আশ্চর্য এই শিক্ষার প্রভাব। সমস্ত রবীন্দ্রকাব্যের ভূমিকা হিসাবেই যেন মহর্ষির আত্মজীবনীকে পড়া যায়। তাঁর জীবনের কোন সুর ব্যর্থ হয়নি, প্রত্যেকটি সুর আশ্চর্যভাবে ফুটেছে রবীন্দ্রনাথের জীবনে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে।

প্রথম পরিচ্ছেদেই দেখি, তাঁর দিদিমার সঙ্গে তিনি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত সূর্যকে অর্ঘ দিচ্ছেন। সেই অল্প বয়সেই সূর্যমন্ত্র তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। সূর্যমন্ত্র যাঁর জীবনের প্রথম দিনগুলিতেই হৃদয়ের সুর যোজনা করলো তাঁর জীবনে সংসারবিমুখ ধর্মসাধনার উপায় নেই। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার ধারাটি লক্ষ্য করলেই দেখবো ধীরে ধীরে বাইরের প্রকৃতি তাঁর মনের কাছে সেই পরম পুরুষের লীলার প্রকাশ হয়ে দাঁড়ালো।

স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার মধ্যে প্রথম ছেদ পড়লো দিদিমার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে; সে বর্ণনা যেমন ভাবগভীর তার সংক্ষিপ্ততা তেমনি দেবেন্দ্রনাথের কলারসিকতার ও শিল্পীসুলভ সংযমের পরিচায়ক ;— "ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নামসংকীর্তন হইতেছিল, 'এমন দিন কি হবে,

হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে,' বায়ুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প আমার কানে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য উদাস-ভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্যের উপরে একেবারে বিরাগ জন্মিল।" (পৃঃ ৪০) জীবনে এই প্রথম নিজের চতুর্দিকের বাস্তবতাকে তুচ্ছ মনে হলো, মনে হলো ঐশ্বর্যে লালিত সেই দেবেন্দ্রনাথ এক নূতনতর স্পর্শ পেলেন যাতে সব ঐশ্বর্যের উপর বৈরাগ্য এসে গেল। এই প্রথম বিরাগের ইতিহাস দিয়েই তাঁর আত্মজীবনী সুরু। এ ঘটনা যখন ঘটে তখন তাঁর আঠারো বৎসর বয়স। ঐ বয়সের বিশেষ ঐ ঘটনাটি দিয়েই আত্মকথার সূত্রপাত। আঠারোটি বছর বিলাসে আমোদে কেটেছে, সেই বছরগুলির উল্লেখ করারও কোন প্রয়োজন মনে করেন নি। মনে হয়নি পিতৃপুরুষের পরিচয় দেওয়ার কথা, মনেই হয়নি বাল্যাবস্থার কোন চিত্র পাঠকের জন্য তুলে ধরার কথা। যেন নিজের ধর্মজীবনের কাহিনী লিখতেই লিখতে বসা, আর যা কিছু সব নিরর্থক।

এই ধরণের নির্লিপ্ততা, জীবনের অন্য সব কিছুর প্রতি এই নিরাসক্তি আর কোন আত্মজীবনীর মধ্যে দেখিনা। ইংরাজী সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ আত্মজীবনীর মধ্যে এই ধরণের কোন বই মনে পড়ছে না। এডওয়ার্ড গিবন্, ষ্টুয়ার্ট মিল, চার্লস ডারউইন, কিংবা রুসো অথবা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, কেউই নিজেদের কথা বলতে গিয়ে বহির্জগতের প্রতি নিরাসক্ত হতে পারেন নি। এঁরা প্রত্যেকেই কিছু কিছু আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন এবং এত উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের কথা বলেছেন যে, জন্মবৃত্তান্ত, পিতৃপরিচয়, ছোটবেলার আনুষঙ্গিক অন্য ঘটনা না বলে যে শুধু নিজের সাধনার ইতিহাস বলা যায় এ তাঁদের ধারণার অগোচর ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কাছে ঈশ্বর-উপলব্ধির জন্য

যে সাধনা সেই সাধনার ইতিহাসই তাঁর জীবন, তাই অনন্যমনা হয়ে জীবনের আর সব কিছু বাদ দিয়েছেন তিনি। ঐ সাধনাতেই তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল, অন্য কোন আকর্ষণই তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। অবনীন্দ্রনাথের লেখায় দেখতে পাই তিনি বলেছেন যে একশো পাঁচ শিষ্যের মধ্যে দ্রোণাচার্য দেখলেন দৃষ্টি আছে এক জনের সে অর্জ্জুন যে আর সব কিছু বাদ দিয়ে তার লক্ষ্য বস্তুটিকে দেখতে পেলো, দৃষ্টি বলে তাকেই। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে সেই একাগ্র দৃষ্টি ছিল তাঁর সাধনার প্রতি, যার ফলে আর সব কিছু তৈরী হয়ে গেল এখন থেকেই। তারপর থেকে যখনই যেখানে গেছেন সবখানেই সেই পরমেশ্বরের স্পর্শ পেয়েছেন। যিনি আমাদের আত্মায়, যিনি আমাদের চেতনায়, তাঁকেই পেয়েছেন দেশে দেশে বিশাল বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে। তাই চতুর্দশ পরিচ্ছেদে বলেছেন "জলে স্থলে তাঁহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিব, দেশভেদে তাঁহার করুণার পরিচয় লইব; বিদেশে বিপদে সংকটে পড়িয়া তাঁহার পালনী শক্তি অনুভব করিব।" (পৃঃ ১০৯) যিনি সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করে আছেন তাঁকে তো কোন বদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে খুঁজে মরলে হবে না, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগের মধ্যে তো কোন গোপনতা নেই, -

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

উপনিষদ তাঁর মনের দ্বার খুলে দিলে। গভীর উৎসাহ আর আগ্রহ নিয়ে একে একে সব উপনিষদ পড়লেন। মনের ভিতরে যত অস্পষ্ট ধারণা ছিল সব ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগলো। কিন্তু নিছক জ্ঞান সঞ্চয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। যা সত্য বলে মনে হলো তা আরও দশজনের মনের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে, নিজের সত্য সাধনার আলোক

আর যারা নেবার জন্য তৈরী তাদের কাছে এনে পৌঁছে দিতে হবে। নিশ্চেষ্ট পাণ্ডিত্যের অভিমান নিয়ে তিনি চুপ করে বসে থাকেন নি। আনন্দের যথার্থ অধিকারী যে হয় সে কৃপণের পুঁজির মতো তাকে আগলে বসে থাকে না। যে আনন্দ আসে সে তো কোন হিসাব নিকাশ নিয়ে আসে না; সে তৃষিত মরুকে অপর্যাপ্ত প্লাবনে ভরে দেয়, কোথাও আল তুলে তাকে বাঁধা যায় না। "এই কারণে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যে কোন মহাত্মা আনন্দ দিযে তাঁকে লাভ করেছেন তাঁরা অমৃত-ভাণ্ডারের দ্বার বিশ্বজনের কাছে খুলে দেবার জন্যই দাঁড়িয়েছেন; আর যাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞান বা কেবলমাত্র আচারের মধ্যে নিবিষ্ট তাঁরাই পদে পদে ভেদ-বিভেদের দ্বারা মানুষের পরস্পর মিলনের উদার ক্ষেত্রকে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করে দেখেন।" (রবীন্দ্রনাথ)। দেবেন্দ্রনাথের মন আচার-নিবিষ্ট নয়, তা সেই পরমপুরুষের অস্তিত্বের সর্বব্যাপ্তি অনুভব করে আনন্দিত, সে আনন্দ কি তাঁকে চুপ করে থাকতে দেয়। সত্যধর্ম প্রচারের জন্য মনে উৎকণ্ঠা বেড়ে উঠলো। আত্মীয় বন্ধু আর ভায়েদের নিয়ে একটি সভা স্থাপন করলেন। পুষ্করিণীর ধারে ছোট কুঠরী চুণকাম করে কৃষ্ণা চতুর্দশীতে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে সভার আয়োজন করলেন। নিজেই ব্যাখ্যা করলেন সেই সভায়। এই সভা দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। তারিখটি অত্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে। ব্রাহ্মধর্মকে নূতন করে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম ধাপ এই 'তত্ত্ববোধিনী' সভা। সভা যে হলো সে খবর আছে, তারিখ আর তিথির খবর আছে, কিন্তু আর কোন বিশদ খবর নেই। হয়তো সে সব খবর অপ্রয়োজন মনে করেছেন বলেই নেই।

তার পরে আত্মজীবনীর বেশ কয়েকটা পরিচ্ছেদ ধরে চললো তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং ব্রাহ্মসমাজের নূতন রূপায়নের

বর্ণনা। বাংলাদেশের জীবনে প্রত্যেকটি ঘটনারই বিশেষ মূল্য আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই সৃষ্টিসম্ভাবনাভরা দিনগুলির বহুমূল্য ফসল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। 'তত্ত্ববোধিনী সভার' প্রথম সাংবাৎসরিক অধিবেশন খুব ধূমধামের সঙ্গে শেষ হলো। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগত গোঁড়ামি কোন দিনই ছিল না দেবেন্দ্রনাথের। আদর্শ এবং কর্তব্যকে যাঁরা বড় করে দেখেন তাঁরা আদর্শ প্রচারের জন্য যেমন প্রতিষ্ঠান তৈরী করেন, তেমনি আদর্শের স্বার্থে নিজেদের গড়া প্রতিষ্ঠান স্বচ্ছন্দে অন্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মিলিয়ে দিতে পারেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। মনে হলো "যখন ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মোপাসনার জন্য সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন ইহার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার যোগ দিলে আমাদের সংকল্প তো আরও অনায়াসে সিদ্ধ হইবে।" (পৃঃ ৭০) কর্মযোগী দেবেন্দ্রনাথ ভাববিহ্বলতার পিচ্ছিল পথকে রসসাধনার নাম দিয়ে নিজেকে ছলনা করেন নি। ব্রাহ্মসমাজের স্বল্প-পরিসরে কাজ সুরু হলো।

এই সময়, তাঁর যখন ছাব্বিশ বছর বয়স, তখন আবার উপনিষদের সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। উপনিষদের নানা মন্ত্রের সঙ্গে মনের সুর মিলে যেতে লাগলো। সেই সব মন্ত্র প্রচার করার বাস্তববোধ তাঁর ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেবেন্দ্রনাথের অক্ষয় কীর্তি। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে তত্ত্ববোধিনীর কি নিবিড় প্রভাব তখনকার দিনে। অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় আর দেবেন্দ্রনাথের অভিভাবকত্বে পালিত 'তত্ত্ববোধিনী' বাংলাদেশে সংবাদপত্র আন্দোলনে নূতন ধারা সুরু করলো। কিন্তু এই তত্ত্ববোধিনী সম্বন্ধেও তিনি আমাদের বিশেষ কোন সংবাদ দেননি। কিন্তু কি কি বিষয়ে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে মতদ্বৈধতা হতো, কোন কারণে শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ গ্রহণীয় নয়, তা বলতে ভোলেন নি।

অষ্টম পরিচ্ছেদে পিতার ইচ্ছার সঙ্গে সংঘর্ষ প্রকাশ পাচ্ছে। দ্বারকানাথ চান মান মর্যাদায় দেবেন্দ্রনাথ যশস্বী হয়ে উঠুন। কিন্তু উপনিষদের বাণী তখন এই মিথ্যা মান মর্যাদার লোভ থেকে কোথায় তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তিনি যে জেনেছেন "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ", তিনি যে জেনেছেন "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ" মান মর্যাদা আর তাঁকে আকর্ষণ করবে না। বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে যে চেতনা তার সঙ্গে তাঁর যোগ যখন হয়েছে তখন মানসম্মান তো তুচ্ছ হবেই। সমস্ত পৃথিবীতে যিনি প্রেমের আহ্বান পেয়েছেন তিনি যে সংসারের যাবতীয় তুচ্ছ বস্তুকে অতিক্রম করে গেছেন।

ব্রাহ্মসমাজে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ তাঁর ভাল লাগেনি। রামমোহন রায় এ নিয়ম চালু করেন নি, উপরন্তু ট্রাষ্ট ডীডে এই কথাই লেখা ছিল যে জাতিধর্মনির্বিশেষে একত্রে ব্রহ্মোপাসনা করতে হবে। দেবেন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত উদার আকাশের মতো মন এই সংকীর্ণতা সইতে পারেনি। মানুষে মানুষে ভেদ জীইয়ে রাখার যে ধর্ম তা কোনদিনই তাঁর মনকে জড়াতে পারেনি। আকাশ যাঁর কাছে অনন্তের বার্তাবহ সেই মুক্ত পুরুষ এই সংকীর্ণতা কি করে সইবেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন রামের অবতারবাদও প্রচারিত হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের আসন থেকে। ভাবসর্বস্ব দৃষ্টি নয় তাঁর, জ্ঞান আর আনন্দ তাঁর চরিত্রকে সমন্বয়ের সৌন্দর্য দিয়েছে, তাই এই সংকীর্ণতাকে তিনি আঘাত করলেন, অন্ধত্বের কাছে হার মানা অবতারবাদের ভেজাল থেকে ব্রাহ্মধর্মকে মুক্ত করলেন। আজও সনাতন হিন্দুধর্মের পাণ্ডারা তীর্থের ঘাট আগলে বসে আছেন। অচ্ছুত হরিজনদের জন্য দ্বার খোলেনি আজও অনেক জায়গায়। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনীতে দেখি কেমন করে দক্ষিণ

ভারতে ভ্রমণকালে তিনি ব্রাহ্মদের মধ্যেও এই জাতের খেলা দেখেও কিছু করতে পারেন নি। দেবেন্দ্রনাথই রামমোহনের উদার সার্বজনীন ধর্মবোধের বাস্তব রূপায়ণের প্রথম শিল্পী। অন্তরে বাইরে দেশের আচরণে সেদিন বিচ্ছেদ ঘটেছে, বিশ্বাসকে বিচারশক্তির প্রামাণ্য দিয়ে যাচিয়ে নেবার মানসিক স্বাস্থ্য চলে গেছে, মানুষে মানুষে ঘটেছে প্রবল বিচ্ছেদ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলছেন "ধনীগৃহের প্রচুর বিলাসের আয়োজনের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে এবং আচারনিষ্ঠ সমাজের কুলক্রমাগত প্রথার মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে মহর্ষি নিজের বিচ্ছেদকাতর আত্মার মধ্যে এই সামঞ্জস্য-অমৃতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। নিজের জীবনে চিরদিন সমস্ত লাভক্ষতি সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে এই সামঞ্জস্যের সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন..... তাঁর চিত্তের এই সর্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসার যাত্রায় ও ধর্মকর্মে সর্বপ্রকার সীমালঙ্ঘন থেকে নিয়ত রক্ষা করেছে, গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হতে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে।" ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশ্যে বেদপাঠের ব্যবস্থা হলো আর অবতারবাদ প্রচার বন্ধ হলো। ১৮৪৩ সাল বাংলার ইতিহাসের স্মরণীয় হয়ে থাকলো শুধু এই জন্যেই যে ঐ বছরেই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের ভার নিলেন। তাঁর হাতেই ব্রাহ্মসমাজ নূতনভাবে গড়ে উঠলো, প্রাণ পেলো, তাই ম্যাক্সমূলার তাঁকে বলেছেন,—"The Nestor of the Brahmo Samaj"। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে" বলেছেন "১৮৪৩ সাল বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয়। এই সালে ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে নবজীবন ও নবশক্তি প্রদান করেন।"

ব্রাহ্মধর্ম কথাটাকে গতানুগতিক মামুলি ধর্মবোধের নামান্তর রেখে দেবেন্দ্রনাথ খুশী হতে পারেন নি। কর্মযোগী তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসকে পাথেয়

করে কাজের পথে চললেন। লোকের সমাগম দেখেই খুশী হবেন এত লঘুচিত্ত তিনি নন। যত লোক ব্রাহ্মসমাজে আসে সকলেই ব্রহ্মোপাসক নয়। কোন বিশেষ প্রতিজ্ঞাপত্র নেই। দেবেন্দ্রনাথ সংগঠন তৈরীর সেই প্রাথমিক কাজে লেগে গেলেন; রামমোহন রায়ের গায়ত্রীমন্ত্র দিয়ে ব্রহ্মোপাসনার বিধান রচিত হলো। মহর্ষির জীবনধারা উপলব্ধি করতে হলে, রবীন্দ্রনাথের উপর মহর্ষির প্রভাব অনুধাবন করতে হলে, এই গায়ত্রীমন্ত্রের সঙ্গে পিতাপুত্রের কি যোগ তা জানতে হবে। উভয়ের জীবনেই এই মন্ত্রের অসীম প্রভাব। একাদশ পরিচ্ছেদে মহর্ষি লিখেছেন "আমি সেই সাবিত্রী দেবীকে ধরিয়াই রহিলাম, কখনো পরিত্যাগ করিলাম না। পুরুষানুক্রমে আমরা এই গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়।" (পৃঃ ৯৭) ব্রাহ্মধর্মের পথ ও মত নির্ধারণ করতে গিয়ে এই গায়ত্রীমন্ত্রের গভীর আবেদন তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। গায়ত্রীর গূঢ় ভাবার্থের সঙ্গে তাঁর বিশ্বাস মিলে যেতে লাগলো, ক্রমে ক্রমে বোধ হলো সেই অনন্ত তেজোময় পুরুষ যেমন আকাশের গ্রহ নক্ষত্রকে পরিচালিত করেন তেমনি তাঁকেও পরিচালিত করেন। মনের মধ্যে অভয় পেলেন, আশ্বাস পেলেন, মনে হলো, এতদিন তো তাঁর হাত ধরেই চলেছি শুধু না-জেনে, আজ তাঁরই সঙ্গে চলবো তাঁরই হাত ধরে। তাঁর সমস্ত সত্তাকে সেই পরম পুরুষ চালিয়ে চলেছেন এই কথা জানামাত্রই কি এক গভীর আশ্চর্য তৃপ্তিতে মন ভরলো। মন্দিরের কৃত্রিম পরিমিতির মধ্যে মানুষ যখন দেবতার পূজা করেছে তখন তিনি এই বিরাট পৃথিবীর মধ্যে দেবতার সাক্ষাৎ পেতে চেয়েছেন। সেই কামনা গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে কিছুটা মিটলো। এই বিরাট বিশ্ব যাঁর চেতনার আলোকধারায় স্নান করে যুগযুগান্তর ধরে চলেছে, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের চেতনাও যে তাঁরই আলোক থেকে

উৎসারিত। সেই মহাচেতনাকে নিজের মধ্যে জানার যে মন্ত্র তাই গায়ত্রীমন্ত্র। "যাঁরা মহর্ষির আত্মজীবনী পড়েছেন, তাঁরা সকলেই জানেন, তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে এই গায়ত্রীমন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর উপাসনার মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রটিই শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে আকার দান করেছে—এই নিভৃতে মানুষের চিত্তকে প্রকৃতির প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত করে, 'বরেণ্যং ভর্গ', সেই বরণীয় তেজকে, ধ্যানগম্য করে তুলেছে।" (শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড)

তাঁর ধর্মসাধনার ঐ মূলমন্ত্রটি আশ্চর্যভাবে অনুবর্তিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে। যে প্রশান্ত উদার আকাশ আমাদের জীবনের পটভূমিকা এঁকে চলে নানা বর্ণে সকালে সন্ধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের সাধনা তার প্রতি বিরূপ ছিল না। নিত্যপরিবর্তনশীল জীবনের স্রোতে কোথাও ধ্যানমগ্ন হয়ে থেমে থাকা রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনার অঙ্গ ছিল না। মহর্ষির জীবনেও দেখেছি ধর্মবোধ তাঁকে গিরিকন্দরে ঠেলে দেয়নি, জীবনের নানা দাক্ষিণ্যকে অগ্রাহ্য করে নিজের চতুর্দিকের ধর্মবুদ্ধির অভিমানের বেড়া তুলতে দেয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন "তাঁর জীবনের অবসান পর্যন্ত দেখা গেছে, তাঁর ব্রহ্মসাধনা প্রাকৃতিক ও মানসিক কোন বিষয়কেই অবজ্ঞা করেনি -সর্বত্রই তাঁর ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ ছিল।" মুক্ত জীবনের সাধনা রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির কাছ থেকেই পেয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সূর্যবন্দনার এত ছড়াছড়ি, সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষের সঙ্গে জীবনের যোগ ঘোষণার এত উৎকণ্ঠা। আত্মজীবনীর বিংশ পরিচ্ছেদে দেখি বেদ আলোচনা করে মহর্ষির মনে এই বোধ ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে যে চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি দেবতার যে উপাসনা সে ঐ বাহ্য জড় বস্তুর উপাসনা নয়, কিন্তু ঐ সবজড় বস্তুর যে অন্তর্যামী চৈতন্যপুরুষ তাঁরই উপাসনা। গায়ত্রীমন্ত্রের মধ্য দিয়ে এই চেতনার উপাসনা

চলেছে। রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের কাব্যসাধনায় এই মন্ত্রের প্রভাব কম নয়। 'পূরবী'র 'সাবিত্রী' কবিতায় ঐ সবিতৃদেবের উপাসনা আছে, যা গায়ত্রীমন্ত্রের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলে যায়। কবি যখন বলেন—

"এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান সুরের তরণী
আয়ুস্রোত মুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।"

কিংবা "তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছে যে ভরে"—
তখন যেন সেই মন্ত্র শুনি "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।"
পত্রপুটে কবি বলেন "তখন মনে পড়ে সবিতা
তোমার কাছে ঋষিকবির প্রার্থনা মন্ত্র
যে মন্ত্রে বলেছিলেন—হে পূষণ,
তোমার হিরণ্ময়পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন
উন্মুক্ত করো সেই আবরণ।"

এর মধ্যেও উপনিষদের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি রয়েছে
"হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।"
মহর্ষির যা জীবনমন্ত্র তা আশ্চর্যভাবে রবীন্দ্রনাথেরও।

গায়ত্রীমন্ত্রের মধ্যে তাঁর স্পর্শ পেলেন। কিন্তু আরও গভীরতর করে পাবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো "তুমি এখন আমার নিকটে বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়াই চলিয়া যাও, তোমাকে আমি ধরিয়া রাখিতে পারি না; তুমি আমার হৃদয়ে স্থায়ী হও।" (পৃঃ ১০২) এই কথাই যেন কবির গানে ধ্বনিত হলো—

"এতো যদি দিলে সখা আরও দিতে হবে হে
তোমারে না লয়ে আমি ফিরিবো না ফিরিবো না।"

আবার নূতন আনন্দস্রোতে হৃদয়ের দুকূল প্লাবিত হয়ে গেল। প্রেমের স্পর্শে হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত হলো। সংসারের সকল তুচ্ছতার মধ্যে সেই চৈতন্যময় পরম পুরুষের স্পর্শ দেখতে পেলেন। "আমি এখন প্রেম পথের যাত্রী হইলাম। জানিলাম, তিনি আমার প্রাণের প্রাণ হৃদয়-সখা, তিনি ভিন্ন আমার এক নিমেষও চলে না।" (পৃঃ ১০২)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধ ও তৎসম্পর্কিত পারিবারিক বিরোধের বর্ণনা আছে। ঊনবিংশ শতাব্দী এক সংঘর্ষের যুগ। প্রাচীন আর নবীন যেন সামনাসামনি মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এই শতাব্দীতে। রামমোহন থেকে স্বরু করে এই যুগের প্রত্যেকটি স্বাধীন মনোবৃত্তি-সম্পন্ন পুরুষ পারিবারিক মতানৈক্যের সৃষ্টি না করে সহজে নিজের কাজ করতে পারেন নি। শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনে আমরা এই ঘটনাই দেখেছি, দেখেছি রামতনু লাহিড়ীর জীবনে। বিদ্যাসাগর, মধুসূদনের ইতিহাস কারো অজ্ঞাত নেই। পিতৃশ্রাদ্ধ কেন্দ্র করে পারিবারিক সংঘর্ষের সামনে এসে দাঁড়ালেন দেবেন্দ্রনাথ। বিদ্রোহ ঘোষণার অতি উত্তেজনা তাঁর চরিত্রের ভারসাম্য আহত করেনি কোথাও। পরন্তু ঐ প্রশান্ত মূর্তির মধ্যে বিশ্বাসের কি অটল মহিমা আপনি ফুটে ওঠে। এই সংঘর্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে কোথাও তিনি নিজের সমর্থনে দুকথা পাঠকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেননি। রাধাকান্ত দেবের কাছে তাঁর বক্তব্য যে ভাবে তিনি বলেছেন তাতে তাঁর স্থৈর্য এবং দৃঢ়তার আশ্চর্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। কারো কাছেই কোন আশ্বাস পান না, ভাইয়েরাও বিরুদ্ধে। কেবলমাত্র লালা হাজারীলাল আশ্বাস দিয়ে বললেন "লোক-ভয় আবার ভয়।" দ্বারকানাথের সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ নীরব, তাঁর

যুগের কোন মহাপুরুষই তাঁর আত্মজীবনীতে বিশেষ স্থান পাননি, কিন্তু কিছুটা জায়গা জুড়েছেন লালা হাজারীলাল। দুঃখের দিনে চতুর্দিকের বিরূপতার মধ্যে লালা হাজারীলাল তাঁর একমাত্র সহায় হলেন, তাঁর বর্ণনা না দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ পারেন নি। হাজারীলালের সমর্থন আর স্বপ্নে দেখা মা'র আশীর্ব্বাদে মনে বল পেলেন। শ্রাদ্ধ নিজের মনের মতোই করলেন। আত্মীয়স্বজন নিমন্ত্রণে এলেন না, কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাসী দেবেন্দ্রনাথ কিছুতেই পৌত্তলিকতার সঙ্গে মিলিত হলেন না।

ঐশ্বর্যের বাঁধন যত খসে যেতে লাগলো ততই যেন মনের ভিতর থেকে মুক্তি কাছে আসতে লাগলো। কারঠাকুর কোম্পানীর যে অংশ দ্বারকানাথের ছিল তা সবটাই দেবেন্দ্রনাথের ভাগে পড়লেও ভায়েদের সমান অংশ ভাগ করে দিলেন। কোম্পানীর অবস্থা যখন টলমলো তখন দেবেন্দ্রনাথই পাওনাদারদের স্বেচ্ছায় সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকার দিতে চাইলেন। সর্বস্ব দেবার পরে মনে কোন ক্ষোভ তো হলই না, পথে ফেরবার সময় দু ভাইয়ে বলতে লাগলেন "আমরা তো বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া সকলি দিলাম, লোকে জানুক আমাদের জন্য আমরা কিছুই রাখি নাই ; তাহারা বলুক যে, ইঁহারা সকল ধন দিলেন, সর্ববেদসং দদৌ।" (পৃঃ ১৪৯) সর্বস্ব দেবার পরে মনের ভিতরে হাফিজের শ্লোক ঘুরে বেড়ায়, বিদ্যুৎ যে কামনা করেছে তার যদি সর্বস্ব বিদ্যুতের শিখায় জলে শেষ হয়ে যায় তবে তার তো ক্ষোভ করার কোন কারণই থাকে না। সমস্ত ঐশ্বর্য গেল, তখনই যেন মনে হল অলঙ্কার যেন মাঝে পড়ে এতদিন ধরে শুধু ব্যাঘাতই করেছে, আর সব গর্ব ছেড়ে সেই একের জন্যই প্রাণ আকুল—"সকল গর্ব দূর করি দিব তোমার গর্ব ছাড়িব না।"

ব্রহ্মকে দেবেন্দ্রনাথ নানারূপে অনুভব করতে চেয়েছেন। তাঁর

মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ, তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," তিনিই চেতনা দেন তিনিই ন্যায়-অন্যায় বোধ দেন, তিনিই বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করেন। আবার সেই অনন্ত ব্রহ্মই আকাশে, পৃথিবীতে, মানুষের মধ্যে, সৌন্দর্য হয়ে বিরাজ করেন, তিনি "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" আবার তিনিই অন্তরে বাহিরে আত্মস্থ হয়ে আছেন, তিনি 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্।" তিনি নানা রূপে, নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কোন একটি রূপে সুখী হননি। সমস্ত বিশ্বে তাঁর প্রভাব বিস্তৃত দেখে তিনি খুসী হয়েছেন।

দেবেন্দ্রনাথের ভিতরে একটি গতিশীল মানুষ বাস করতো যে কখনো তাকে চুপ করে বসে থাকতে দেয়নি। পাহাড়ে পাহাড়ে, নদীতে নদীতে বেড়িয়ে তাঁর মন আনন্দের সন্ধানে ঘুরেছে। মনের ভিতরে সেই অনন্তের জন্য প্রেম যত গভীর হয়েছে ততই যেন পাহাড়-পর্বতের আকর্ষণ বেড়েছে। বাড়ীতে পৌত্তলিকতা রহিত করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু নিজের মত অন্যের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সঙ্গত মনে হলো না। দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে সেই জবরদস্তি কোথাও নেই। নিজে যা সঙ্গত মনে করেছেন তা প্রচার করেছেন, তার জন্য কষ্ট স্বীকার করেছেন, কিন্তু অন্যের বিশ্বাস ও ভক্তিতে আঘাত করার উগ্রতা তাঁর স্বভাবের মধ্যে কোথাও ছিলনা। তাই পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে বলছেন "সকলের মনে কষ্ট দিয়া, সকলের মতের বিরুদ্ধে, আমাদের ভদ্রাসন বাড়ী হইতে চিরপ্রচলিত পূজা ও উৎসব উঠাইয়া দেওয়া আমার কর্তব্য বোধ হইতেছে না। আমি আপনিই ইহাতে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র থাকি, তাহাই ভাল। আমাদের পরিবারের মধ্যে কাহারো যদি ইহাতে বিশ্বাস থাকে, কাহারো ভক্তি থাকে, তাহাতে আঘাত দেওয়া অকর্তব্য।" (পৃঃ ১৯১) নূতন প্রবাণের সেই সংঘর্ষের

যুগে সহনশীলতার অভাব ছিল চতুর্দিকেই। যারা নূতন তারা তাদের নূতনত্বের উগ্রতা দিয়ে প্রাচীনকে আঘাত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠতো, যারা প্রাচীন তারাও নূতনকে তেমনি ভাবেই আঘাত করেছে সুবিধা পেলেই। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এর ব্যতিক্রম। ধনী আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে যেমন তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী করলেন, সেখানে যেমন তাঁর সাহস আর দৃঢ়-চিত্ততার অভাব হলো না এতটুকুও, ঠিক তেমনি অন্য-দিকেও পাছে কারো বিশ্বাসে আঘাত লাগে তাই নিজের সিদ্ধান্ত জোর করে কারো উপরে চাপালেন না। আশ্চর্য এই মানসিক ঔদার্য।

কিন্তু কারো মনে আঘাত লাগবে এই ভয়ে যেমন দুর্গাপূজা উঠিয়ে দিলেন না, তেমনি নিজে বাড়ীতে থাকাও উচিত মনে করলেন না। প্রত্যেকবার পূজা আসে, আর তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। কখনো স্থলপথে, কখনো জলপথে নানা দেশ ঘুরে বেড়ান, সমুদ্রবিহারেও বেরিয়ে পড়লেন একবার। যা কিছু চোখে ভাল লেগেছে তারই মধ্যে অনন্ত পুরুষের মহিমা দেখেছেন। অতি সংক্ষিপ্ত দুলাইনের বর্ণনায় সেই ভালো লাগাকে প্রকাশ করেছেন। মাঝে মাঝে মনে হয় দেবেন্দ্রনাথের মত আত্মসমাহিত পুরুষ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় বোধহয় আর দ্বিতীয় কেউ নেই, অন্ততঃ আত্মজীবনী পড়লে এ কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সমুদ্রের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু শিল্পিজনোচিত, "সমুদ্রের নীল জল ইহার পূর্বে আর আমি কখনো দেখি নাই। তরঙ্গায়িত অনন্ত নীলোজ্জ্বল সমুদ্রে দিনরাত্রির বিভিন্ন বিচিত্র শোভা দেখিয়া অনন্ত পুরুষের মহিমায় নিমগ্ন হইলাম।" (পৃঃ ১৯৫) শিল্প-সন্ধানী দৃষ্টি কোথাও শান্ত হয়ে নেই। মুলমীন সহরের উত্তরে

পার্বত্যগুহা দেখতে গেলেন, বৃষ্টির ধারায় ক্ষয় হয়ে হয়ে কেমন স্বাভাবিক কারুকর্ম হয়েছে গুহার ভিতরে তা দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। পুরীতে গেছেন, সেখানে বিমলা দেবীর মন্দিরে প্রণাম না করে ফিরে এলেন, কিন্তু উৎকলবাসীদের প্রসাদ বিতরণে কোন জাতিভেদের বালাই না দেখে ভারী খুসী হলেন। মাঝে মাঝে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন করে আশ্বিন মাস আসবে। মনের ভিতরে আনন্দের স্রোত উচ্ছল হয়ে ওঠে। ঘরের বাঁধন ছেড়ে বাইরে যেতে হবে শুনলেই খুসী হন। হাফিজের কবিতা আবৃত্তি করেন, প্রেমের মধ্য দিয়ে যার পূজা, তাঁকে তো কবিতা দিয়েই আহ্বান করার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকা করে কাশী গেলেন। পথে ঝড় ওঠে, নৌকা আছড়ে পড়ে ডাঙ্গার উপর। তিনি তার মধ্যে সেই 'মহদ্ভয়ং বজ্র-মুদ্যতং' এর মহিমা অনুভব করেন। কাশী থেকে এলাহাবাদ, এলাহাবাদ থেকে আগ্রা। দেখলেন তাজমহল। এখানেও চার লাইনের বর্ণনা। "এ তাজ পৃথিবীর তাজ। আমি তাজের একটা মিনারে উঠিয়া দেখি, পশ্চিম দিক হইতে সমুদয় রাঙা করিয়া সূর্য অস্ত যাইতেছে, নীচে নীল যমুনা; মধ্যে শুভ্র স্বচ্ছ তাজ, সৌন্দর্যের ছটা লইয়া যেন চন্দ্রমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে।" (পৃঃ ২২৮) আগ্রা থেকে দিল্লী। সেখানে যেতে যেতে যমুনার ধারে ধারে শস্য ক্ষেত্রের গ্রাম ও উদ্যানের রূপ ভাল লাগতো। মন শান্ত হতো। আত্মজীবনী পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয় এই চতুর্দিকের সৌন্দর্যের মধ্যে মনের শান্তি পাওয়া, এ যেন রবীন্দ্রনাথের "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে" কিংবা "তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই" এর সুর বাজিয়ে তোলে। কুতুবমিনারের সর্বোচ্চ চূড়া থেকে পৃথিবীকে দেখলেন—"আমি সেই মিনারের সর্বোচ্চ চূড়াতে উঠিয়া অর্দ্ধ-নভোমণ্ডলের নিম্নে মহদায়তন ভূমির

বিচিত্রতা দেখিয়া পুলকিত হইলাম। এই সেই মহতো মহীয়ানেরই মহিমা।" (পৃঃ ২৩১) চলে গেলেন অমৃতসরে; সেই অমৃতসরোবর যেখানে শিখেরা অলখ-নিরঞ্জনের ভজনা করে, যে স্বয়ম্ভু নিরঞ্জন সম্বন্ধে নানক বলেছেন 'থাপিয়া ন জাই, কীতা ন হোই, আপে আপ্ নিরঞ্জন সোই।" সেই নিরঞ্জনের পূজা দেখার জন্য ব্যগ্র মনে গেলেন গুরুদ্বারে। কোন ধর্মকেই দূরে ঠেলেননি। যেখানে মনের সুর মিলেছে খুসী হয়েছেন সেখানেই। অমৃতসরের যে বাসায় তিনি ছিলেন সে বাসা ভাঙ্গা, অগোছালো বাগান, এলোমেলো গাছ। কিন্তু নানা দেশ ঘুরে, নানা রূপ দেখে মন তখন আনন্দে টল্‌মল্ করছে। সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন ঐ সময়ের প্রকৃতির সৌন্দর্যের। যেমন কবিত্বের স্নিগ্ধ স্পর্শ সেই বর্ণনায়, তেমনি সহজ সরল হৃদয়ছোঁওয়া ভাষা দীর্ঘ উদ্ধৃতি হলেও, তুলে দেওয়ার লোভ সংবরণ করা কঠিন—"অরুণোদয়ের প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেতপীত লোহিত ফুল সকল শিশির জলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজত কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যান-ভূমিতে জরির মছনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত, যখন দূর হইতে পাঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীতস্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্বপুরীবোধ হইত। কোন কোন দিন ময়ূর-ময়ূরীরা বন হইতে আসিয়া আমার ঘরের ছাদের একতলায় বসিত, এবং তাহাদের চিত্রবিচিত্র দীর্ঘ পুচ্ছ সূর্যকিরণে রঞ্জিত হইয়া মৃত্তিকাতে লুটাইতে থাকিত।.....একদিন মেঘ উঠিল, আর দেখি যে, ময়ূরেরা মাথার উপরে পাখা উঠাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এ কি আশ্চর্য দৃশ্য! আমি যদি বীণা বাজাইতে জানিতাম, তবে তাহাদের নৃত্যের তালে তালে তাহা বাজাইতাম। দেখিলাম যে, কবিরা ঠিক বলিয়া গিয়াছেন, মেঘ উঠিলেই ময়ূরেরা আনন্দে নৃত্য

করিতে থাকে, 'নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।' এ তাঁহাদের কেবল মনের কল্পনা মাত্র নহে।

"ফাল্গুন মাস চলিয়া গেল, চৈত্রমাস মধুমাসের সমাগমে বসন্তের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং অবসর পাইয়া দক্ষিণবায়ু আম্র-মুকুলের গন্ধে সদ্য প্রস্ফুটিত লেবু ফুলের গন্ধ মিশ্রিত করিয়া কোমল সুগন্ধের হিল্লোলে দিগ্বিদিক আমোদিত করিয়া তুলিল। ইহা সেই করুণাময়েরই নিশ্বাস। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে দেখি যে আমার বাসার সংলগ্ন জলাশয়ে কোথা হইতে অপ্সরারা আসিয়া রাজহংসীর ন্যায় উল্লাসের কোলাহলে জলক্রীড়া করিতেছে। এমনি করিয়া সুখে কালস্রোত চলিয়া গেল।" (পৃঃ ২৩৭-৩৮)

এই অপূর্ব বর্ণনা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত। রূপ বর্ণনায় তাঁর যে স্বাভাবিক স্বল্পভাষণের নিয়ম তার ব্যতিক্রম ঘটেছে এখানে। ভিতরকার কবি মানুষটি সকল আবরণ-মুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি-সাধক দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বংশের পরবর্তী রসস্রষ্টাদের জন্য যে কি ঐতিহ্য রেখে গিয়েছিলেন তা এই ভ্রমণের বর্ণনাগুলি থেকেই অনুভব করা যায়।

১৮৫৬ সালের পূজোয় বেরুলেন উত্তরভারত ভ্রমণে, ১৮৫৭র এপ্রিলে চল্লেন সিমলা অভিমুখে। প্রথম জীবনের ধর্মসাধনা আর উত্তরভারত ভ্রমণ এই নিয়েই মোটামুটি আত্মজীবনী সমাপ্ত। এই পার্বত্যাঞ্চল ভ্রমণ তিনি অনেকখানি বর্ণনা করেছেন। ভ্রমণবৃত্তান্ত হিসাবেও ঐ রচনা অল্পমূল্য নয়। বর্ণনা শুধু নিছক ছবি আঁকার জন্য নয়, সে বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির ধ্যানগম্ভীর রূপটি ফুটেছে। ধর্মসাধক আর কবি পাশাপাশি একটি জীবনের বীণাতেই সুর বাজিয়ে চলেছে। সিমলা থেকে ডগশাহী পাহাড়, সেখান থেকে আবার সিমলা, সিমলা থেকে সুন্নী, সেখান থেকে নারকাণ্ডা। এমনি করে নানা পাহাড়ে পাহাড়ে

ঘুরে মনের ভিতরে একদিন শুনতে পেলেন এক অশ্রুতপূর্ব ধ্বনি—যে সত্য এই ভ্রমণে পেলেন সেই সত্য প্রচারের আদেশ। উপনিষদের মন্ত্রে যিনি উদ্বুদ্ধ, গায়ত্রীমন্ত্র যাঁর জীবন-মন্ত্র, অভ্রভেদী পর্বত শৃঙ্গের মধ্যে সেই অনন্তের বার্তা পেয়ে আনন্দে তাঁর দিন কাটে। জীবনে 'ঈশাবাস্য-মিদং সর্বং' সত্য হয়ে ওঠে। গুর্খা আক্রমণ জীবনে নূতন অভিজ্ঞতার যোজনা করে। ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস রেখে নিজেকে আতঙ্কিত হতে দেন না। গুর্খা আক্রমণের আতঙ্ক যখন কাটলো তখন উচ্চতর পর্বতে যাবার জন্য মন ব্যস্ত হয়ে উঠলো। রোমান্টিক মনের অতৃপ্তি কোথাও তাঁকে চুপ করে বসে থাকতে দেয়না। সঙ্গী কিশোরী চলতে চায় না, আর তাকে ফেলেই এগিয়ে চলেন। সঙ্গে রান্নার লোক নেই। হিন্দী প্রবচন আওড়ে খুসী হন "রুখাসুখা গমকা টুকরা, লোনা অওর অলোনা ক্যা? সির দিয়া তো রোনা ক্যা।" অনুসন্ধানী দৃষ্টি নানা জিনিষ দেখতে দেখতে চলেছে। সব কষ্ট, সব পথশ্রম তুচ্ছ করে চলেছেন। পথের ধারে নানা বর্ণের ফুল দেখেছেন, তাদের সৌন্দর্য আর লাবণ্য, তাদের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা সেই 'পরম পবিত্র পুরুষের' হাতের স্পর্শ মনে করায়। অকারণে এই সৌন্দর্য মনের মধ্যে হাফিজের কবিতা ধ্বনিত করে তোলে। সুন্দরের আরাধনায় হাফিজ তাঁর সঙ্গী। "প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন, তেমনি পারস্যের সৌন্দর্যকুঞ্জের বুলবুল হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনে আনন্দ-প্রভাতে উপনিষদের শ্লোকগুলি ছিল প্রভাতের আলোক আর হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান। হাফেজের কবিতার মধ্যে যিনি আপনার রসোচ্ছ্বাসের সাড়া পেতেন তিনি যে তাঁর জীবনেশ্বরকে কিরকম নিবিড় রসবেদনাপূর্ণ মাধুর্যঘন প্রেমের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে দেখেছিলেন সে কথা অধিক করে বলাই বাহুল্য।" (রবীন্দ্রনাথ)

আত্মজীবনীর এই অংশে তিনি কোথাও জোর করে নিজেকে গোপন করেননি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রকাশ করেন নি। জীবনভোর যে মন্ত্রে প্রাণের বীণা বেজেছে তাকেই যেন পাহাড়ে পর্বতে নানারূপে নানাভাবে খুঁজে বেড়ালেন। উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ যে দেবেন্দ্রনাথকে আমরা দেখি এ যেন তাঁরই আত্মানুসন্ধানের নূতন সাধনা। ঋণশোধের বাস্তব কারণেই দেশের লোক তাঁকে মহর্ষি বলেছিল, কিন্তু তাঁর বাইরের জীবনের সততা ছাড়াও তাঁর মনের ভিতরে যে আত্ম-উপলব্ধির প্রশান্ত দীপ্তি ছিল, তাতেই যেন মহর্ষি নাম সার্থক হয়েছে। পথে পথে ঘুরে বেড়ান আর সেই মহিমা অনুভব করেন; উপনিষদে যে সত্যকে পান তাকে জীবনেও দেখতে পান। তাই পথ চলার সঙ্গে উপনিষদ আর হাফিজের শ্লোককে মিলিয়ে সাধনা পূর্ণ করেন। এমন করে নিজের প্রাণ ভরানো আর কোন জীবনে ঘটেছে কিনা জানিনা। পূর্ণ আনন্দে ভরা মন গভীর রাত্রে গেয়ে ওঠে—

"গো, শম্অ, ম য়ারেদ্ দরীঁ জম্অ, কে ইম্শব্
দর্ মজ্লিসে-মা মাহে রুখে, দোস্ত্ তমাম্ অস্ত্।

আজ আমার এ সভাতে দীপ আনিও না। আজিকার রাত্রিতে সেই পূর্ণচন্দ্র আমার বন্ধু এখানে বিরাজমান।" (পৃঃ ২৭০) এই ভ্রাম্যমান জীবনে হঠাৎ এই সত্য প্রতিভাত হলো যে যা মূলতত্ত্ব তা তো মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তা স্বতঃসিদ্ধ, তা সর্ববাদিসম্মত, তা আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত। সব সত্যই দেবেন্দ্রনাথের কাছে আলোর মতো সহজ হয়ে স্বতঃপ্রকাশ হয়েছে। তিনি সকল কাজের সকল কারণের কারণ—"এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"—উপনিষদ জীবনে তাঁর যথার্থ সত্য হলো, শুধু মন্ত্র মাত্র রইলো না। সব

দেখা যখন ঈশ্বরের দেখার সঙ্গে মিলে গেল, যখন সব সৃষ্টির ভিতরের চেতনাটিকে জানলেন পথে প্রবাসে দিন কাটিয়ে দিয়ে তখনই যেন হৃদয়ের ভিতর থেকে বলতে পারলেন—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

তারপর এই ভ্রাম্যমান জীবনে মনের ভিতরে একদিন আদেশ পেলেন ফিরে আসার। চলে এলেন তৎক্ষণাৎ। আত্মজীবনী ঐখানেই শেষ হলো। যে মন্ত্র প্রথম জীবনে পেয়েছিলেন তাকে জীবনের সমস্ত সুখের সঙ্গে বেঁধে নিলেন। যখন জীবনে পূর্ণতা এলো তখন আর নিজের কথা বলার কোন সার্থকতা পেলেন না। পূর্ণতার জন্য যে অতৃপ্তি সে কেমন করে পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে সাধনায় মত্ত রাখলো তারই কথাটুকু আত্মজীবনীতে বলেছেন।

নিজের কর্মজীবনের অতি অল্প পরিচয়ই তিনি দিয়েছেন। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস খুললেই দেখা যাবে নানা সামাজিক কাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। আত্মজীবনীতে অল্প কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে। সে ঘটনাগুলিরও তাঁর ধর্মসাধনার সঙ্গে নিবিড় যোগ। যে সব ঘটনার সেই যোগ নেই সে গুলিকে তিনি অতি সন্তর্পণে বর্জন করেছেন। তাই আগাগোড়া যা কিছু লিখেছেন, যা কিছু বলেছেন, সব ঐ সাধনার ক্রমবিকাশ আর পরিণতির সঙ্গে জড়িত। অন্য কোন বাংলা আত্মজীবনী এমন নিবিড় ভাবে সাধনাকেন্দ্রিক নয়। শিবনাথ শাস্ত্রীও ধর্মপ্রচারকের কাজ করেছিলেন, বহুকাল তিনি বাঙালীর জাতীয় জীবনে আচার্যের সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর জীবন কাহিনী তাঁর জীবনের সামগ্রিক প্রকাশের ছবি। যা কিছু স্মরণীয় ঘটেছে জীবনে, যা কিছু উল্লেখযোগ্য, নানা বয়সে নানা সময়ে সব তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই দেবেন্দ্রনাথের

আত্মজীবনী অন্য সব আত্মজীবনীর থেকে মূলতঃ পৃথক। এ যেন ধ্যানমুগ্ধ সাধকের আত্মবিভোর হয়ে নিজের গান গাওয়া।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলেছেন ঐ যে শ্মশানে পাওয়া আনন্দ সে আনন্দ কোন তত্ত্ব আলোচনার পথ ধরে আসেনি যুক্তি তর্কের কণ্টকিত পথে ঐ আনন্দ পাবার নয়। সেই আনন্দ পাবার জন্য মন পাগল হয়েছে। কেউ ব্রহ্মতত্ত্ব শোনায়নি, কেউ ধর্মপথে চলার সদুপদেশ দেয়নি, কিন্তু আপনা আপনি অকস্মাৎ মনে হলো কোথা থেকে যেন আনন্দের অফুরন্ত স্রোত মনের দুকূল ছেয়ে চলে গেল। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবোধ যে সেই সংস্কারাচ্ছন্ন যুগে অত সহজ, অত প্রাণপূর্ণ হয়েছিল তার কারণই হলো এই যে ধর্ম তাঁর কাছে সহজ আনন্দরূপে এসেছে, পুথির পাতায় চড়ে আসেনি। "এই ঔদাস্য ও আনন্দ লইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমি বাড়ীতে আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার আর নিদ্রা হইল না। এ অনিদ্রার কারণ আনন্দ। সারা রাত্রি যেন একটা আনন্দজ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল।" (পৃঃ ৪১) চতুর্দিকের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই আনন্দ যখন অযাচিতভাবে এলো মনে তখন মনে হলো এ যেন ঈশ্বরের দান। সেই কৃপার জন্য সারাজীবন তিনি কৃতজ্ঞ রইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখি সেই বৈরাগ্য, সেই ঔদাসীন্য তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছে। নিজের আসবাবপত্র বিলিয়ে দিচ্ছেন, বোটানিক্যাল গার্ডেনের এক সমাধিস্তম্ভে বসে আছেন, গান গাইছেন। কিন্তু মনের বিষাদ ঘোচে না, ঈশ্বর চিন্তায় তন্ময় হয়ে ওঠেন। ঈশ্বরের কথা শোনবার জন্য মহাভারত পড়তে সুরু করে দিলেন, নিজেই বলেছেন ধর্মপিপাসায় ঐ গ্রন্থ পাঠ করি। পরবর্তীকালে দেখি যে

ধর্মপিপাসায় শুধু মহাভারত কেন, বেদ, উপনিষদ, হাফিজ সবই ঐ এক পিপাসা চরিতার্থ করার জন্য পড়া। মহাভারত পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রও পড়তে সুরু করলেন। সেখানে যা কিছু গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে তাকেই গ্রহণ করার জন্য মনের ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন। তাই অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের মতো য়ুরোপীয় দর্শন আলোচনা করলেন। কিন্তু মনের সঙ্গে কোথাও মিললো না। মনে হলো এমন করে যারা প্রকৃতিকে সর্বস্ব করে ধরে, প্রকৃতির অধীন হয়েই যারা খুসী, তাদের সঙ্গে তো মনের মিল হবে না কোনদিনই। তাই বলেছেন "আমি ইহাতে কিরূপে তৃপ্ত হইব? আমার চেষ্টা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য; অন্ধবিশ্বাসে নয়, জ্ঞানের আলোকে। তাহা না পাইয়া আমার ব্যাকুলতা দিন দিন আরো বাড়িতে লাগিল। এক একবার ভাবিতাম, আমি আর বাঁচিব না!" (পৃঃ ৪৯-৫০)

অল্প বয়সে দেবেন্দ্রনাথের মন ছিল রোমান্টিক। তাই অশান্ত প্রেমিকের মতো ঈশ্বরের সন্ধানে ছুটেছেন। অতৃপ্তি গভীরতর হয়েছে, মিটছে না বলেই কামনা করেছেন মৃত্যু।

ঐ অনুসন্ধান থেকে কোন ফসলই যে ফললো না তা নয়। বিষয়কে জানলে তবেই বিষয়ীকে জানা যায়, এই বোধটুকুও তো পাওয়া গেল। ধর্মজ্ঞানের এই প্রথম সূর্যালোকটুকু বিষয়বোধের মধ্য দিয়েই মনে এলো। এই প্রাথমিক ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো এই যে জীবন, এই যে নিয়ম এতো জড়ের শাসন নয়, এ এক চেতনার শাসন। এই জ্ঞান পাবার সঙ্গে সঙ্গে আশ্বস্ত হলেন একটু। ভগবানের অনন্ত জ্ঞানস্বরূপতা বুঝলেন আকাশের উদারতার মধ্য দিয়ে। এও সেই মনের রোমান্টিক ধর্মের জন্যই। আকাশের উদারতা তাঁর জীবনে ঔদার্য এনে দিল। বুদ্ধির

বিতর্কে নয়, বইপড়া প্রজ্ঞায় নয়, প্রকৃতির স্পর্শজাত হৃদয়ানুভূতি দিয়েই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সত্যকে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে বৃহৎ লীলা চলেছে এ কি শুধু জড় জগতের নিয়মে চলছে। জড়ের কোন লক্ষ্য থাকতে পারে না, লক্ষ্য থাকে চেতনের, "অতএব একটি চেতনাবান্ পুরুষের শাসনে এই বিশ্বসংসার চলিতেছে। দেখিলাম, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাতার স্তন্যপান করে। ইহা কে তাহাকে শিখাইয়া দিল? তিনিই, যিনি ইহাকে প্রাণ দিয়াছেন। আবার মাতার মনে কে স্নেহ প্রেরণ করিল? যিনি তাঁহার স্তনে দুগ্ধ দিলেন, তিনি। তিনিই সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ ঈশ্বর, যাঁহার শাসনে জগৎসংসার চলিতেছে।" (পৃঃ ৫২) এই বোধ আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ শান্ত হলো। চেতন কোন সত্তার আদেশে বিশ্বলীলা চলছে এ কথা তিনি সারাজীবন বিশ্বাস করেছেন এবং কোন ধর্মগ্রন্থ পড়ার আগে উপনিষদের এই মূল সুরটি আশ্চর্য-ভাবে নিজের জীবনে পেয়েছিলেন।

প্রথম বয়সে অনন্ত আকাশ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সেই মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে আবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন। মনে হলো ঐ আকাশের মতোই ঈশ্বর অনন্ত। ঐ বিরাট আকাশ যেমন সীমাহীন, কোন বিশেষ আকার দিয়ে যেমন তার পরিধি রচনা করা যায় না তেমনি আদিঅন্তহীন তিনি। "তিনি হাত দিয়া এ বিশ্ব গড়ান নাই; কেবল আপনার ইচ্ছার দ্বারা এই জগৎ রচনা করিয়াছেন।" (পৃঃ ৫২) বুঝতে পারলেন শালগ্রাম বা কালী কোন রূপই তাঁর নয়।, তিনি অসীম, তাঁকে পুতুলের আকারে বাঁধা যায় না।

স্রষ্টার স্বরূপ কি? এই নিয়ে মনে আর কোন তর্ক রইলো না। কিন্তু তিনি যে জগতের আদিস্রষ্টা, তিনি যে মূল সৃষ্টিকর্তা, তিনি যে

নিত্য, অবিকৃত, অপরিবর্তনীয় এ বিষয়ে সংশয় ঘুচলো না পরিষ্কার ভাবে। কত বুদ্ধির আলোচনায় এই সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে চললেন। এই যে মানসিক অবস্থা, একদিকে জানবার একটা প্রকাণ্ড আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে সেই আকাঙ্ক্ষা মিটনোর আকুল প্রয়াস, তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে যখন ধর্মের ব্যাকুলতা প্রবল হল তখন তিনি যে অনন্ত নেতি নেতিকে নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেননি সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু তিনি যে সেই ব্যাকুলতার বেগে সমাজের ও পরিবারের চিরসংস্কারগত অভ্যস্ত পথে তাঁর ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করে দিয়ে কোনমতে তাঁর কান্নাকে থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করেননি এইটেই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি কাকে চাচ্ছেন তা ভালো করে জানবার পূর্বেই তাঁকেই চেয়েছিলেন—জ্ঞান যাঁকে চিরদিনই জানতে চায়, প্রেম যাঁকে চিরকালই পেতে থাকে।"

যখনই বুঝলেন ঈশ্বরের শরীর নেই, প্রতিমা নেই, তখনই মনে এলো নূতন যুগের প্রথম ব্রহ্মজ্ঞানী রামমোহন রায়। এই প্রসঙ্গে পঞ্চম পরিচ্ছেদে রামমোহনের যে ছোট্ট ছবিটি এঁকেছেন তা যেমন জীবন্ত তেমনি সংক্ষিপ্ত। অল্পবয়সে দেবেন্দ্রনাথ একদিন গিয়েছিলেন রাজা রামমোহনকে প্রতিমা দর্শনের নিমন্ত্রণ করতে। রামমোহন সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। বহুকাল পরে একুশ বছর বয়সে সেই কথা মনে পড়লো। মনে মনে সংকল্প করলেন প্রতিমা পূজায় বা কোন ধরণের পৌত্তলিকতায় অংশ গ্রহণ করবেন না। আশ্চর্য এই যে এমন একটি প্রসঙ্গে এসেও দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেননি। আর যে কোন আত্মজীবনীতেই এই ধরণের নীরবতা বিস্ময়কর বলে মনে হতো। কিন্তু দেবেন্দ্র-

নাথের স্থির দৃষ্টি নিজের ধর্মজীবনের কাহিনী ব্যাখ্যানে আবদ্ধ তাই অত্যন্ত নিষ্করুণভাবে যেখানে যেটুকু প্রযোজন তাব বাইবে একটি কথাও বলেন না তিনি।

প্রতিমার বন্ধন থেকে পবমেশ্বরকে মুক্ত কবে নিজের মধ্যে, পৃথিবীব মধ্যে পাবার যে সাধনা সেই সাধনা দেবেন্দ্রনাথের। যিনি অতি সহজেই তাঁব সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত তাঁকে হাবিয়েছি বলেই নানা মূর্তিব খণ্ডতায তাঁকে পাবার ব্যর্থ চেষ্টায় মানুষ মেতে ওঠে। দেশ একদিন তাব সামগ্রিক জীবনে জাগ্রত চেতনার স্পর্শ পেয়েছিল কিন্তু অভ্যাসেব বশে ধীবে ধীবে তাব হৃদয় এক অদ্ভুত জড়তায আচ্ছন্ন হয়ে গেল, চেতনা লুপ্ত হলো। রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থাটিব আলোচনা কবে বলেছেন—"অসাড দেশকে জাগাবাব জন্যে যখন বিধাতার আঘাত এসে পড়তে থাকে তখন যেখানে চৈতন্য আছে সেইখানেই সমস্ত আঘাত বাজতে থাকে, সেইখানকাব বেদনা দিয়েই দেশেব উদ্বোধন আরম্ভ হয়। আমবা যাঁব কথা বলছি তাঁব সেই সহজচেতনা কিছুতেই লুপ্ত হযনি, সেই তাঁর চেতনা চেতনাকেই খুঁজছিল, স্বভাবতঃই কেবল সেইদিকেই সে হাত বাড়াচ্ছিল, চার-দিকে যে-সকল স্থূল জড়ত্বেব উপকবণ ছিল তাকে সে প্রাণপণ বলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল —চৈতন্য না হলে চৈতন্য আশ্রয় পায় না যে।"

এমনি সমযে উপনিষদের একটি ছেঁড়া পাতা হাওযায ভেসে এল। পড়ে দেখলেন ঈশোপনিষদেব সেই শ্লোক—

'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম।'

যে ঈশ্বরকে আকাশ-দেখা তরুণ দৃষ্টিতে সর্বব্যাপী বলে মনে হয়েছিল তাঁবই সর্বব্যাপ্তিব কথা। এই শ্লোকেব যে অর্থ এবং ব্যাখ্যা

দেবেন্দ্রনাথ করেছেন তার মধ্যেই তাঁর ধর্মবোধ যে কেমন রসদৃষ্টির মধ্য দিয়ে এসেছিল তার পরিচয় আছে। "'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ', তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর। তিনি কি দান করিয়াছেন? তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই পরম ধনকে উপভোগ কর। আর সকল ত্যাগ করিয়া সেই পরম ধনকে উপভোগ কর; আর সকল ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাকে লইয়াই থাক।" এই ভাবে মনের মধ্যে যে অনুভূতি আপনা আপনি এসেছিল সেই অনুভূতির সমর্থন পেলেন উপনিষদের এই ঋষিবাক্যে। যে ঋষি প্রথম এই বাক্য চিন্তা করেছিলেন তিনি ধন্য, তাঁর কাছ থেকেই পেলেন ব্রহ্মানন্দের স্বাদ।

উপনিষদের এই ছিন্নপত্র উড়ে বেড়ানো দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের অপার করুণা বলে ধরে নিয়েছেন। আমাদের কাছে এটা একটা accident বলে মনে হয়েছে—দেবেন্দ্রনাথের জীবনে, ব্রাহ্মসমাজের জীবনে, বাঙালীর জীবনে এটা একটা বহুমূল্য accident. অনেক কাল ধরে বাঙালীর চেতনা যে জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিলো তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ তাই তাঁর অশান্ত ক্রন্দনের মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতির ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থাটিকে তাঁর অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন "এমন সময় এই অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্যে তাঁর সামনে উপনিষদের একখানি ছিন্নপত্র উড়ে এসে পড়ল। মরুভূমির মধ্যে পথিক যখন হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন অকস্মাৎ জলচর পাখিকে আকাশে উড়ে যেতে দেখে সে যেমন জানতে পারে তার তৃষ্ণার জল যেখানে সেখানকার পথ কোন্ দিকে, এই ছিন্ন-পত্রটিও তেমনি তাঁকে একটি পথ দেখিয়ে দিলে। সেই পথটি সকলের চেয়ে প্রশস্ত এবং সকলের চেয়ে সরল যৎ কিঞ্চ জগত্যাং

জগৎ ; জগতে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তর ভিতর দিয়েই সে পথ চলে গিয়েছে এবং সমস্তর ভিতর দিয়েই সেই পরম চৈতন্যস্বরূপের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে যিনি সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে রয়েছেন।"

পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করবেন এর পর থেকে দেবেন্দ্রনাথের মনে আর কোথাও কোন সন্দেহ নেই। নিজের উপলব্ধিকে স্পষ্টতর করবার জন্য নানা শাস্ত্র অনুসন্ধান করেছেন, বহু চিন্তায় সত্যের অন্বেষণ করেছেন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালীর জীবনে এক যুগান্তরকারী ঘটনা। এই পত্রিকার সৃষ্টি ও সার্থকতা নিয়েই এক ইতিহাস লেখা যেতে পারে। কিন্তু পত্রিকার প্রাণদাতা ও স্রষ্টা দেবেন্দ্রনাথ অতি অল্প কথায় তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। শুধু ধর্মচর্চা নয়, জাতীয় জীবনে 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রভাব আরও ব্যাপক ছিল। কিন্তু নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ কোন অতিরিক্ত উৎসাহ দেখান নি। যেটুকু উৎসাহ দেখান স্বাভাবিক ছিল তাও দেখান নি।

ব্রাহ্মদের একটা বিশিষ্ট গোষ্ঠীবদ্ধ করে তোলার কাজে তিনি আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। তারই জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা, তারই জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, তারই জন্য মাঝে মাঝে উদ্যান-সম্মেলন। নানা শাস্ত্র আহরণ করে ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী রচিত হয়। উপনিষদ থেকে শ্লোক নিলেন, তার সঙ্গে তন্ত্রের যোজনা করলেন, নিজের মনোমত করে কিছু সংশোধন করলেন। ব্রাহ্ম সমাজের একটা নির্দিষ্ট উপাসনা প্রণালী স্থির হলো। ১৮৪৫ সালে খবর পেলেন উমেশ সরকার ও তার স্ত্রীকে জোর করে খৃষ্টান করা হয়েছে। এই ঘটনা তাঁকে আঘাত করলো। তত্ত্ববোধিনীতে অক্ষয় দত্তের লেখনী চালিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে কর্মী দেবেন্দ্রনাথের দেখা পেলুম আমরা। সহরের সম্ভ্রান্ত

লোকেদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে অখৃষ্টান বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ চললো। 'হিন্দুহিতার্থী' বিদ্যালয় স্থাপনা হলো, দেবেন্দ্রনাথ হলেন সম্পাদক। এই বিদ্যালয়ের আর কোন উল্লেখ নেই, তার পরিণতি কি হলো সে কথাও নেই।

গঙ্গাবক্ষে নৌকারোহণে রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে যাত্রার যে বর্ণনা আছে তার মধ্যে দ্বারকানাথের মৃত্যুসংবাদ আসাতেই তা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। দেবেন্দ্রনাথ ঐ নৌকাভ্রমণের সুবিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। প্রকৃতির প্রশান্ত মূর্তি বর্ণনায় তাঁর যেমন দক্ষতা তেমনি দক্ষতা তাঁর প্রকৃতির রুদ্রমূর্তি বর্ণনায়। বৈষয়িক কার্যের ভার গিরীন্দ্রনাথের উপব ছেড়ে দিযে তিনি যেন আশ্বস্ত হলেন এবং মনে হলো যে ঐ ভাব না থাকাতে "আমি ব্রাহ্ম সমাজেব কাজের জন্য প্রচুর অবসর পাইল'ম।" বেদ অধ্যয়নেব জন্য নিজব্যয়ে কাশীতে ছাত্র পাঠিয়েছিলেন। ব্যবসায় পতন না হওয়া পর্যন্ত তাদেব ব্যয়ভার বহন কবেছিলেন। এই কটি কাজের উল্লেখ ছাডা আর একটি মাত্র কাজের উল্লেখ কবেছেন এবং তার উপরেই গুরুত্ব আবোপ করেছেন সবচেয়ে বেশি, সেটি হলো ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ রচনা। বেদ যখন সর্বথা গ্রাহ্য হলো না, উপনিষদ যখন উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধকে অতিক্রম করে 'সোঽহমস্মি' 'তত্ত্বমসি' মন্ত্র প্রচার করলো, তখনই মনে হলো উপনিষদে তো সব অভাব মিটবে না, হৃদয় তো পূর্ণ হবে না। তখন অনুভব করলেন ব্রাহ্মধর্মের জন্য নূতন আশ্রয়ভূমি দরকার—"বেদে তাহার পত্তনভূমি হইল না, উপনিষদেও তাহার পত্তনভূমি হইল না, কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম যে, আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি।" (পৃঃ ১৬৭) এমনি করে বেদ-বেদান্ত পার হয়ে যখন নিজের মনের চেতনা ও বিশ্বাসকেই চরম করে জানলেন তখন

তো নীরব থাকার উপায় রইলো না। বেদ উপনিষদকে যদি শেষ পর্যন্ত প্রামাণ্য বলে ধরে না নেওয়া যায় তবে ব্রাহ্মদের কাছে প্রামাণ্য কি হবে? এই প্রশ্ন তাঁর চিত্তকে ব্যাকুল করলো। কিন্তু যেমন মনের ভিতর থেকে সাড়া পাননি বলেই বেদ-বেদান্তকে চরম বলে মানতে পারেন নি তেমনি ঠিক মনের ভিতর থেকেই মন্ত্র পেলেন ব্রাহ্মধর্মের নূতন ভিত্তি স্বরূপ। ঘটনাটি লক্ষ্য করার মতো, "আমি অক্ষয়কুমার দত্তকে বলিলাম যে, 'তুমি কাগজ কলম লইয়া বসো, আমি যাহা বলি তাহা লিখিতে থাকো।' এখন আমি একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের দিকে হৃদয় পাতিয়া দিলাম। তাঁহার প্রসাদে আধ্যাত্মিক সত্য সকল আমার হৃদয়ে যাহা উদ্ভাসিত হইতে লাগিল আমি তাহা উপনিষদের মুখে নদীর স্রোতের ন্যায় সতেজে বলিতে লাগিলাম।" (পৃঃ ১৭৬) এমনি করে ব্রাহ্ম-ধর্মগ্রন্থ লেখা হলো। সে গ্রন্থও উপনিষদের সার-সংকলন করেই লেখা। কি লেখা হলো অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্যটি কি, ব্রহ্মের স্বরূপ কি, এ কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে এতে তাঁকে পরিশ্রম করতে হয়নি—'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ', যিনি ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষে আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করেন সেই জাগ্রত জীবন্ত দেবতাই আমার হৃদয়ে এই সকল সত্য প্রেরণ করিলেন। ইহা আমার দুর্বল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত নহে, ইহা মোহবাক্যও নহে, প্রলাপ বাক্যও নহে। ইহা আমার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁহারই প্রেরিত সত্য।" (পৃঃ ১৭৯) বিশেষ মুহূর্তের অনুপ্রেরণায় তাঁর মনের সমস্ত সত্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হলো।

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে কোন চরিত্রই বিশেষ প্রাধান্য পায়নি। শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ সকলের আত্মজীবনীতেই নানা চরিত্র, ছোটবড়, এসে ভীড় করেছে। সে চরিত্র-

গুলির কোন কোনটি বেশ কিছু অংশ জুড়ে পাঠকের মনকে খুসী করে মানবজীবনের কোন বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্পর্শ পৌঁছে দেয়। দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। অতি অল্প চরিত্রের উল্লেখ তিনি করেছেন। দুএকটি চরিত্র সম্পর্কে কিছু আলোকপাত ঘটলেও অধিকাংশ চরিত্রই ফোটেনি, বিশেষ করে ফোটানোর চেষ্টাও তিনি করেন নি। এটাকে দুর্বলতাই বলতে হবে। হয়তো উক্তিটা দুঃসাহসিক হয়ে গেল, তবু আমার মনে হয় লেখকের এতটা নির্লিপ্ত হওয়ার জন্যই যে দুচারটি চরিত্র এসেছে তারা বইয়ের পাতাতেই রয়ে গেল, পাঠকের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছাল না। যে সমস্ত চরিত্র আত্ম-জীবনী রচনার সময়েই দেশমান্য ব্যক্তি বলে পরিগণিত হন তাঁদের সম্বন্ধেও তিনি নীরব। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ, রাধাকান্ত দেব এঁদের সম্বন্ধে তিনি কোন কথাই বলেন নি। অবশ্য একথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে কোন চরিত্রকে প্রাধান্য দেননি বলেই হয়তো পাঠকের মন অবান্তর প্রসঙ্গচ্যুতি থেকে রক্ষা পেয়ে মূল বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়েছে।

বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক ইতিহাসের আলোচনায় দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর একটা সুনির্দিষ্ট স্থান আছে। বাংলা ভাষা দেবেন্দ্রনাথের হাতে যে লালিত্য আর মাধুর্য লাভ করলো তা তাঁর পূর্ববর্তীদের ধারণার অগোচর ছিল। কোথাও কোথাও এ গদ্য আশ্চর্যভাবে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কখনো বা আধুনিকতর গদ্যভঙ্গীর পূর্বাভাষও পাওয়া যায়। তৎসম শব্দের ব্যবহারই তিনি প্রায় সব সময় করেছেন। বিংশ পরিচ্ছেদে লিখছেন "তিনি তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিয়া আপনার প্রাণ, মন, প্রীতি, ভক্তি, সকলি তাহাতে অর্পণ করেন এবং অপরাজিত চিত্তে তাঁহার শাসন করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন

করেন।" (পৃঃ ১৫৭) —এ ভাষা রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ষটত্রিংশ পরিচ্ছেদে ভাষা আরও আধুনিক কোথাও কোথাও—"ভাদ্রমাসে হিমালয়ের জটাজূটের মধ্যে জল-কল্লোলের বিষম কোলাহল, তাহার প্রস্রবণ সকল পরিপুষ্ট নির্ঝর সকল প্রমুক্ত, পথ সকল দুর্গম।" (পৃঃ ২৬৭-৬৮) বহু উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো যেতে পারে যে দেবেন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গী বাংলা সাহিত্যের পূর্বতন গদ্য-রচয়িতাদের ধারা থেকে যেমন সহজ ও সুন্দরতর তেমনি পরবর্তী যুগের বাংলা গদ্যের প্রথমতম পথ নির্দেশকও বটে।

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক আত্ম-জীবনী। পরবর্তীকালে যাঁরা আত্মজীবনী লিখেছিলেন তাঁদের কাছে দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থ যে আদর্শ হিসাবে কাজ করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুন্দর আত্মবিশ্লেষণ ও অকপট আত্ম-উদ্ঘাটন এই গ্রন্থকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

রাসসুন্দরী—আমার জীবন

রাসসুন্দরীর 'আমার-জীবন' বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ। আত্মজীবনী রচনার কোন আদর্শই তখন বাংলাসাহিত্যে ছিল না। নিজের জীবনকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যসৃষ্টি করা চলে ঐ ধারণা তখনও সাহিত্যিক মহলে স্বীকৃত হয়নি। বাংলা গদ্য তখন সবে মাত্র বঙ্কিম দেবেন্দ্র যুগ পার হয়েছে। এ হেন অবস্থায় পঁচাশী বছরের এক বৃদ্ধার হাত থেকে 'আমার জীবন' সৃষ্টি অল্প বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' তখনও প্রকাশিত হয়নি। দেশবাসীর কাছে আত্মজীবনী রচনা ও পাঠের কোন মানদণ্ড স্থির হয়নি। তবু রাসসুন্দরী তাঁর যে জীবনকথা লিখে গিয়েছেন তা তাঁর অসম সাহস ও আত্মবিশ্বাসের পরিচায়ক।

রাসসুন্দরী কিছু মহামানবী নন; তাঁর জীবনে এমন কিছু ঘটেনি যাতে পাঠকসাধারণের বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশের কারণ থাকতে পারে। তিনি সম্পত্তিশালী গৃহস্থের ঘরের বৌ, পরবর্তী জীবনে কর্ত্রী। লেখাপড়া শেখা তখনকার দিনে মেয়েদের পক্ষে সহজ ছিল না। কতকষ্টে লোকচক্ষু এড়িয়ে তিনি যে একটু একটু করে পড়তে শিখে-ছিলেন তার বিবরণ তাঁর লেখাতেই আছে। তবু শুধু প্রাণের একান্ত বাসনায় সেই অল্পশিক্ষিত গ্রাম্য বধূ একদিন লিখতে পড়তে শিখলেন—এবং এমন সহজ সরলভাবে তাঁর জীবনকথা ব্যাখ্যা করে গেছেন যাতে বিশেষ চিত্তাকর্ষক ঘটনা কিছু না থাকলেও পাঠকের মন মুগ্ধ হয়।

"আমার জীবন" দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে তাঁর জীবনের কিছু কিছু ঘটনা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয় ভাগ ভগবৎ-বন্দনাতেই পরিপূর্ণ। এই দুইভাগে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তিনি লিখেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল পরবর্তী দিনগুলিকে নিয়ে একটি তৃতীয় ভাগ করার। গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে লিখেছেন—"আমার জীবন-চরিত দ্বিতীয় ভাগ এই পর্যন্তই ক্ষান্ত থাকিল। আমার জীবনান্ত হইলে আমার বংশের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন তিনি আমার শেষভাগ লিখিবেন।" জীবনে কোন কিছুর অভাব ছিল না তাঁর। ধন জন পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজনে ঘর পূর্ণ ছিল—যা পেয়েছিলেন তা অল্প নয়। কিন্তু আরও বেশী চাওয়ার লোভ ছিল না বলেই সারাজীবন তিনি আনন্দের সঙ্গে কাটিয়েছেন। কখনও কারও সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করতে হয়নি তাঁকে, যা কিছু সংসারে দেখেছেন তাই তাঁর ভালো লেগেছে। সংসারে সব জিনিষকে ভালো লাগার একটা বিশেষ ক্ষমতা না থাকলে অত তৃপ্তির সঙ্গে, অত শান্তির সঙ্গে নিজের জীবনের কথা বলা যায় না। লেখাপড়া অল্প জানতেন, তাই গ্রন্থ শেষে সবিনয়ে বলেছেন—'এই বইখানি আমার নিজ হস্তের লেখা। আমি লেখাপড়া কিছুই জানি না। পাঠক মহাশয়েরা তোমরা যেন অবহেলা না কর, দেখিয়া ঘৃণা করিও না। অধিক লেখা বাহুল্য। তোমরা সব জান, যাহাতে পরিশ্রম সফল হয় করিবে।"

শ্রদ্ধেয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন। তাঁর দু একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করলেই সপ্রমাণ হবে তখনকার রসিক সমাজে এই গ্রন্থ কেমন সমাদর পেয়েছে। তিনি লিখেছেন "মনে করিয়াছিলাম যেখানে কোন ভাল কথা পাইব সেইখানে পেন্সিলের দাগ দিব। পড়িতে পড়িতে দেখি, পেনসিলের দাগে গ্রন্থকলেবর ভরিয়া

গেল। বস্তুতঃ ইঁহার জীবনের ঘটনাবলী এমন বিস্ময়জনক এবং ইঁহার লেখায় এমন একটি অকৃত্রিম সরল মাধুর্য আছে যে গ্রন্থখানি পড়িতে বসিয়া না শেষ করিয়া থাকা যায় না।" রাসসুন্দরী স্বভাবতঃই ছিলেন ধর্মশীলা। কিন্তু সে ধর্ম বাইরের আড়ম্বর-সর্বস্ব নয়, সে-ধর্ম একান্তভাবে তাঁর জীবনের সুখদুঃখ ভালমন্দের সঙ্গে জড়িত। এই কথাটি তাঁর গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে। সেই মূল বক্তব্যটি সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন "ইঁহার ধর্ম বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান আড়ম্বরে পর্যবসিত নহে, ইঁহার ধর্ম জীবন্ত আধ্যাত্মিক ধর্ম। জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ইনি ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পান, তাঁহার করুণা উপলব্ধি করেন, তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া থাকেন; এক কথায় তিনি ঈশ্বরেতেই তন্ময়। এরূপ উন্নত ধর্মজীবন সচরাচর দেখা যায় না।" শেষ পর্যন্ত এর ধর্মমূল্যকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বড় করে দেখেছেন আর বলেছেন এমন উপাদেয় গ্রন্থ ঘরে ঘরে থাকা উচিত।

রাসসুন্দরী অল্পস্বল্প কবিতা লিখতেও পারতেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদেই কিছু কিছু কবিতার যোজনা করেছেন। আজকালকার দিনে চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার ছন্দের পূর্বসূচনা কোন পাঠকেরই ভাল লাগে না, কিন্তু তখনকার দিনের পাঠকের কাছে এই ধরণের কবিতার একটি বিশেষ আবেদন ছিল। সেই সব কবিতাই ভক্তির উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। চৈতন্যজীবনী পড়ার অভ্যাস ছিল রাসসুন্দরীর। সেই অভ্যাস থেকেই হয়তো ঐ সব কবিতা লেখার ঝোঁক চেপেছিল তাঁর। কবিতাগুলির কাব্যমূল্য বিশেষ নেই, বৈষ্ণবপ্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে কোথাও কোথাও। যেমন:—

রাসসুন্দরীর জন্ম ধন্য করি গণি।
শ্রবণ পরশে তব নামামৃত-ধ্বনি॥

দ্বিতীয় ভাগের পঞ্চদশ রচনার কবিতাটিতে সেই প্রভাব আরও সুস্পষ্ট—

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ বামেতে কিশোরী।
ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ রূপ মনোহারী॥
যুগল কিশোর রূপ হেরিয়া নয়নে।
চন্দন তুলসী পুষ্প দিতেছি চরণে॥
স্বপনে এরূপ হেরি প্রফুল্ল হৃদয়।
রাসসুন্দরী বাঞ্ছা পূর্ণ কর দয়াময়॥

লেখক বা লেখিকার নামের আকর্ষণে অনেক সময় আত্মচরিত গ্রন্থ পাঠকসমাজের কাছে বিশেষ মূল্যের দাবী রাখে। কিন্তু যেখানে সে রকম কোন আকর্ষণ নেই সেখানে সম্পূর্ণ লেখার উৎকর্ষের উপরেই তার মূল্য নির্ভর করবে। রাসসুন্দরীর নামের কোন আকর্ষণ পাঠক-সমাজে নেই, কোন স্মরণীয় কাজও তিনি করে যান নি, যার জন্য আজকের পাঠক তাঁর লেখা পুরানো বইয়ের আলমারী ঘেঁটে খুঁজে খুঁজে পড়বে। তবুও লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো এই যে রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' এর তৃতীয় সংস্করণও হয়েছিল। পুরানো দিনের যে গন্ধটুকু আছে স্বভাবতঃই, সেটুকু বাদ দিলে ঐ গ্রন্থ যে সুখপাঠ্য এবং শুধু সুখপাঠ্য নয়, নূতন ভাবনাও জাগিয়ে তোলে, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। তখনকার দিনে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাটাই একটা অপরাধ বলে গণ্য হতো, সাহিত্য-প্রচেষ্টা বলতে বড় জোর দুএকটা ভক্তিমূলক কবিতা হয়তো ক্বচিৎ কেউ লিখে থাকবেন, কিন্তু ঘরের ভিতরে জীবন-কাটানো কোন মহিলার পক্ষে আত্মজীবনী লেখার চরম দুঃসাহসের কাজ পাঠক সমাজের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। বার্ধক্যের জন্য স্থানে স্থানে মাত্রাহীন পুনরুক্তি প্রকাশ পেলেও

সাধারণতঃ রাসসুন্দরীর রচনায় কোন অসুস্থতার লক্ষণ নেই। সহজ ভাব আর সরল ভাষার মিশ্রণে রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' সত্যিই উপাদেয় গ্রন্থ হয়েছে।

রাসসুন্দরীর জীবনে একটা সহজ গতি দেখা যায়, কোন অস্বাভাবিক চমক লাগানো ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেনি। অল্প বয়সে বাপের বাড়ীতে আদর যত্ন পেয়েছেন অনেক। সেই অল্পবয়সেব স্মৃতিচিত্র প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদে আছে। অল্পবয়সের একটি ছোট ঘটনা তাঁর সারা জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। তাঁর মা তাঁকে বলেছিলেন—'তোমার যখন ভয় হইবে, তখন তুমি সেই দয়ামাধবকে ডাকিও, দয়ামাধবকে ডাকিলে তোমাব আর ভয় থাকিবে না।" সারা জীবন ধরে ঐ সত্যটিকে অনুভব ও উপলব্ধি করে এসেছেন। ঐ একটি উপলব্ধিব ইতিহাস তাঁব 'আমার জীবন'। পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, জ্ঞান কিছুরই বালাই ছিল না, কেবল মায়েব শেখানো একটি মন্ত্র সারা জীবন ধরে নিজের জীবনে ধীরে ধীবে সত্য করে তুললেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে জীবনের আর সব ঘটনাকে পিছনে ফেলে ঐ উপলব্ধির কাহিনীকে 'আমার জীবনে'ব মূল বক্তব্য করে তোলার সচেতনতা তাঁর মধ্যে এল কোথা থেকে।

শুধু তাই নয়, অনেক বিষয়ে রাসসুন্দরীর দৃষ্টি ছিল প্রগতিশীল। নিজে তিনি অদম্য উৎসাহ নিয়ে অতিকষ্টে অক্ষর পরিচয় করেছিলেন, তিনি চাইতেন মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হোক। এ বিষয়ে অত্যন্ত উদার দৃষ্টি ছিল তাঁর। মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট—"তখন আমাদিগের দেশের সকল আচার ব্যবহারই বড় মন্দ ছিল না, কিন্তু এই বিষয়টি ভারি মন্দ ছিল। সকলেই মেয়েছেলেকে বিদ্যায় বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখনকার মেয়েছেলেগুলা নিতান্ত

হতভাগা, প্রকৃত পশুর মধ্যে গণ্য করিতে হইবে।" আর এক জায়গায় বলছেন, "আহা কি আক্ষেপের বিষয়! মেয়েছেলে বলিয়া কি এতই দুর্দ্দশা। চোরের মত বন্দী হইয়াই থাকি, তাই বলিয়া কি বিদ্যাশিক্ষাতেও দোষ। সে যাহা হউক এখনকার মেয়েছেলেগুলা যে নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতায় আছে তাহা দেখিয়াও মন সন্তুষ্ট হয়।" অতি অল্প বয়স থেকেই যিনি গ্রাম্যবধূ তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী আজকের পাঠককে চমকে দেবে নিশ্চয়ই। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশাচার উন্নততর ব্যবস্থার পথ ছেড়ে দেবে, এ কথাও তিনি বলেছেন। নিজের দুঃখকে বড় করে না দেখে সমস্ত দেশের পরাধীন মেয়েদের মুখপাত্র হয়ে কথা বলার মধ্যে উন্নততর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

তাঁর মার মৃত্যুসময়ে তিনি মার কাছে যেতে পারেন নি। তার জন্য তাঁর আক্ষেপের শেষ ছিল না। মেয়ে হয়ে জন্মানোর ফলে তিনি ছিলেন পরাধীন, তাই দুর্লভ মানবজীবন লাভ করেও তাঁর দুঃখের শেষ নেই। দুঃখপ্রকাশের মধ্যে তাঁর কোন দার্শনিকতার উচ্ছ্বাস নেই, সহজ সরল ভাষায় মনের বেদনা প্রকাশ করেছেন। মাত্রাবোধ ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে লিখছেন—"পৃথিবী মধ্যে পশুপক্ষ্যাদি যে কিছু ইতর প্রাণী আছে, সর্বাপেক্ষা মনুষ্যজন্ম দুর্লভ বটে। সেই দুর্লভ জন্ম পাইয়াও আমি এমন মহাপাতকিনী হইয়াছি। আমার নারীকুলে কেন জন্ম হইয়াছিল ...আমি যদি পুত্রসন্তান হইতাম, আর মার আসন্নকালের সংবাদ পাইতাম তবে আমি যেখানে থাকিতাম পাখীর মত উড়িয়া যাইতাম। কি করিব, আমি পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী।"

নিজের দৈনন্দিন জীবনের বিবরণ যে আত্মজীবনীর পাতা ভরাতে পারে না, একথা তিনি সঠিক বুঝতেন। পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ ছিল তাঁর,

তাই তাঁর দিনযাপনের মামুলি ঘটনাগুলোকে প্রধান করে তুলতে পারেন নি। তাই বলছেন "সে কথায় প্রয়োজন নাই। বলিতেও লজ্জা বোধ হয় এবং বলাও বাহুল্য।" যদিও ঘরোয়া জীবনকে তিনি একেবারে বাদ দেন নি তবু সহৃদয়পাঠক মাত্রেই বুঝবেন যে ঘরোয়া জীবনের তুচ্ছতা তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের মহৎ উপলব্ধির পথ রুদ্ধ করতে পারেনি।

উচ্চশিক্ষিতা না হলেও আশ্চর্য বোধশক্তি ছিল তাঁর। তাঁর শাশুড়ীর মৃত্যুর পর তাঁরই হাতে সংসারের সকল ভার এল। না'মের পরিবর্তন এলো, দায়িত্ব বাড়লো জীবনে অনেক। একটা কালের পরিবর্তন এলো জীবনে, যে ছিল বধূ সে হয়ে বসলো সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী। এই পরিবর্তন প্রত্যেক নারীর জীবনেই আসে। কিন্তু সচেতনভাবে এই পরিবর্তন অনুভব করা সহজ কথা নয়। তীক্ষ্ণ বোধশক্তি না থাকলে তা সম্ভব হয় না। তিনি লিখছেন—"পূর্বে আমার শরীরের অবস্থা এবং মনের ভাব যে প্রকার ছিল, এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আমি যেন এখন সে আমি নই, আমি যেন ভিন্ন আর একজন হইয়াছি। আমার মনের দুর্বলতা ঘুচিয়া কত বল এবং সাহস প্রাপ্তি হইল...... আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, আমি এখন আচ্ছা একজন গৃহস্থ হইয়াছি, এ আবার কি কাণ্ড। এখন অধিকাংশ লোকে আমাকে বলে কর্তা ঠাকুরাণী।" এই গৃহিণীপণা থেকে নানা পরিবর্তন আসতে লাগলো। যে বৌ বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে কাজ করতো তারই হাতে সমস্ত সংসার চালিত হতে লাগলো। এই পরিবর্তনের ধারাটিকে ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তোলার মধ্যে লেখিকা তাঁর শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছেন।

'আমার জীবনে'র প্রথম ভাগের অষ্টম রচনায় লেখিকা তাঁর দেবতার কাছে যে প্রার্থনা জানিয়েছেন তা তাঁর মনের দীপ্তি ও সততার

পরিচায়ক। নিজের জীবনের নিন্দনীয় অংশটাকে গোপন রাখতে চাওয়া মানুষের অতি স্বাভাবিক দুর্বলতা। বিশেষ করে আত্মজীবনী রচনা সম্পর্কে একদল লোক এই অভিযোগ করে থাকেন যে নিজেকে লোকপ্রিয় করে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই আত্মজীবনীর রচনা। রাস-সুন্দরীর কথাগুলি ঐ প্রসঙ্গে মনে রাখার মতো—'আমি যদি আপনার নিন্দিত কর্ম বলিয়া কিছু গোপন রাখিয়া থাকি তাহা তুমি প্রকাশ করিয়া দাও। আমার যে কথা স্মরণ না থাকে তাহা তুমি আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও। আমি যে প্রবঞ্চনা করিয়া কোন কর্ম করিব, কিম্বা কথা বলিব, এমন চেষ্টা আমার কখনই নাই।"

আত্মবিশ্লেষণেও লেখিকা কম যান না। একদিকে ঘর-সংসার তাঁর মন ভরে থাকে আর একদিকে মন সীমাতীতের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সংসারকে অস্বীকার করে নয়, সংসারকে অতিক্রম করে তিনি নিজেকে পেতে চেয়েছেন। তাঁর এই মনোভাবটিকে তিনি অতি সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।—"আমার মন যেন তখন ষড়ভুজ হইল। দুই হাতে ঐ সংসারের সমুদয় কাজ করিতে চাহে; যেন বালবৃদ্ধ কেহ কোনমতে অসন্তুষ্ট না হন। আর দুই হাতে ঐ কয়েকটি ছেলে সাপটিয়া বুকের মধ্যে রাখিতে চাহে। অন্য দুই হস্তে আমার মন যেন চাঁদ ধরিতে চাহে।" নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করতে লেখিকা যেমন বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তেমনি মানুষের চরিত্র সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা দুর্বল নয়। গ্রন্থের নানা জায়গায় যে সব মন্তব্য ছড়িয়ে আছে সেগুলির গভীরতা দেখলে অবাক হতে হয়। লেখিকা নিজের পুত্রকন্যাদের মৃত্যু স্মরণ করে অত্যন্ত শান্তভাবে লিখছেন "সংসারী লোকের প্রতি পরমেশ্বর সম্পদ বিপদ দুটি সমান করিয়া দিয়াছেন। কেহ বা কষ্টের কথাটি আগ্রহ করিয়া মনে রাখিয়া সতত কষ্টভোগ করিতেছে। কোন

কোন লোক এমনও দেখা যায়, তাঁহাদিগের শত শত বিপদের রাশি সম্মুখে থাকিলেও তাঁহারা সেদিকে দৃষ্টিপাতও করেন না।" এই ধরণের সজাগ দৃষ্টি যাঁর তাঁর উচ্চশিক্ষা ছিল না এইটেই আশ্চর্য। গ্রাম্যবধূ আটাশী বছর বয়সে এই সব কথা লেখার মধ্য দিয়ে সুনিশ্চিতভাবে তাঁর মানসিক তারুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

১২৭৫ সালে তাঁর বই প্রথম ছাপা হয়—তখন লেখিকার উনষাট বছর বয়স। আবার নূতন আকার দিলেন আটাশী বছর বয়সে, ১৩০৩ সালে। নিজের জীবনে নানা পরিবর্তন ঘটে গেছে, বার্ধক্যের প্রভাব স্ফুটতর হচ্ছে প্রতিদিন। লেখিকা নিজের জীবনের প্রতি এক অবাক বিস্ময় নিয়ে চেয়ে আছেন। নিজের মধ্যে সৃষ্টির যে নানা পরিবর্তনশীল লীলা চলেছে তাকে অনুভব করা বা তার রহস্যের ধারণালাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। রাসসুন্দরী সেই ধরণের মহিলা যিনি সুদীর্ঘ জীবন এই বিরাট সৃষ্টিকে নিজের মধ্যে গতিশীল হতে দেখেছেন অবাক বিস্ময়ে। তাই বলছেন—'আমার এই শরীর, এই মন, এই কাঠামোতেই দেখিতে দেখিতে কয়েক প্রকার হইল, অনবরত আমার শরীরের মধ্যে খোদকারী হইতেছে। কি আশ্চর্য আমি ইহার কিছুই জানিতে পারি না। সেই কারিকরকে শত শত ধন্যবাদ দিই।"

বার্ধক্যের ফলে লেখিকার রচনায় পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে। যেমন "১২১৬ সালে চৈত্রমাসে আমার জন্ম হয়, আর এই ১৩০৩ সালে আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর হইল। আমি ভারতবর্ষে আসিয়া এত দীর্ঘকাল যাপন করিলাম।"—এই কথাগুলি যে কতবার বলেছেন তার শেষ নেই।

গ্রন্থের শেষাংশে তাঁর ধর্মভাব ও ধর্মচিন্তার মামুলী কথাই বলেছেন। তাই এই অংশে পাঠকের মন তুষ্ট হবার কোন উপাদান

খুঁজে পাবে না। ভগবানকে তিনি জীবনযাত্রার অধিকারী বলে উল্লেখ করেছেন। এবং সেই অধিকারীকে উদ্দেশ্য করে যে সব কথা লিখেছেন তা অপূর্ব, মাঝে মাঝে বঙ্কিমের রচনা মনে করিয়ে দেয়—

"হে অধিকারী মহাশয়, এই কলিযুগে তোমার সেই কালোবরণ রাইরূপেতে গিল্টি করা হইয়াছে. এখন তুমি তোমার যাত্রার আসরে আসিয়া গৌরচন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছ।" কিংবা অন্য যায়গায় লিখছেন - "হে অধিকারী মহাশয়, তোমার সেই বৃন্দাবনের ধড়াচূড়া মোহনবাঁশী, সেই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁকা রূপটি, সেই কৃষ্ণচন্দ্রের পালাটি সমাপ্ত করিয়া তুমি আর কি নূতন নূতন পালা করিবে সেইটি স্থির করিয়াছিলে।"

বাইরের জীবনের তরঙ্গ তাঁর নিভৃত জীবন স্পর্শ করেনি। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগান্তরকারী নানা ঘটনার উল্লেখমাত্র তাঁর রচনায় নেই। তবু মন তাঁর আশ্চর্যরকমের উদার ছিল, তাঁর 'আমার জীবন' সেই ঔদার্যের রসসিঞ্চিত।

রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আদর্শের সংঘাতের দিনে নূতন শিক্ষা পেয়ে যে সমস্ত লোক জাতির ঘুমন্ত জীবনে চেতনার সঞ্চার করলেন তাঁদেরই একজন মনীষী রাজনারায়ণ বসু। রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আরও অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতাদের জীবনে আমরা দেখেছি যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার সময় তাঁরা তাঁদের আত্মীয় স্বজন পিতামাতার কাছ থেকে বাধা কম পান নি। কিন্তু রাজনারায়ণ বসুর জীবন অন্যদের থেকে একটু পৃথক। তাঁব পিতা রামমোহনের সঙ্গী ছিলেন। তিনি চাইতেন পুত্র বাজনারায়ণ ব্রাহ্ম হোক। হিন্দুধর্মের তৎকালীন সংস্কারের জড়ভার থেকে তিনি মুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই নূতন চিন্তা গ্রহণের যে প্রাথমিক মানসিক সংঘাত, সেই সংঘাত তাঁকে সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু পিতার আশ্রয় পেলেও অন্য বাধা তাঁকে কিছু কিছু পেতে হয়েছে। বিধবাবিবাহ দেবার জন্য তাঁব পিতৃব্যের সঙ্গে মনোমালিন্য হলো, জনসাধারণের একাংশ তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, তবু সেই সেই যুগের অন্যান্য যোদ্ধাদের মতো একটুও বিচলিত হননি তিনি। সেদিনকার বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে মনীষী রাজনারায়ণের প্রভাব অল্প ছিল না। একদিকে উৎকট পাশ্চাত্ত্যপ্রীতি অন্যদিকে গোঁড়ামীর পাঁকে আকণ্ঠ ডুবে থাকা—এ দুয়ের বাইরে ছিলেন তিনি। মধুসূদন আর ভূদেব এই দুই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে স্থিরবুদ্ধি রাজনারায়ণ। হিন্দু কলেজের একই সময়ের এই তিন ছাত্রের মধ্যে বাঙ্গালীর মনের তিনটি ধারা ধরা পড়েছে।

রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' খুব সুখপাঠ্য গ্রন্থ নয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী যেমন পাঠকচিত্তকে নানা আকর্ষণে বেঁধে রাখে, দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী যেমন পাঠকের সামনে এক অপূর্ব সাধনার ইতিহাস উদ্ঘাটিত করে, রাজনারায়ণের আত্মচরিত তেমন করে মনকে মুগ্ধ করে না, বিস্মিত করে না। 'আত্মচরিত'-রচয়িতা এই কথাটি ভুলে গিয়েছিলেন যে তাঁর জীবনের কৃতিত্বঘোষণার স্থান 'আত্মচরিত' নয়। জীবনের বিকাশে লোকের কৌতূহল থাকতে পারে, কিন্তু সেই বিকাশটা যখন বিশেষ কতকগুলো ঘটনার ভারে চাপা পড়ে যায় তখন সেই ঘটনাগুলো পাঠকের কাছে জীবনের গতিকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। আত্মপরিচয় যদি আত্মঘোষণা বা আত্মবিজ্ঞপ্তি হয়ে দাঁড়ায় তবে পাঠকের ঔৎসুক্য থাকে অতি অল্পই। রাজনারায়ণ বসু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধাংশের অতি সম্মানিত গুরুস্থানীয় পুরুষ। কিন্তু তাঁর আত্মচরিত তাঁর আত্মপ্রসাদের অত্যধিক উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। বাংলার সাহিত্য-পাঠকদের মনে মনীষী রাজনারায়ণের যে ছবি ভেসে ওঠে সেই লোক তাঁর নিজের কথা বলতে গিয়ে আত্ম-উচ্ছ্বাসে ভরে উঠবেন এ কথা ভাবতে কষ্ট হয়। তাঁর রচনার প্রশংসায় কোন পত্রিকা কি বলেছে, কোন বন্ধু কি ভাষায় অভিনন্দন জানালেন, মেদিনীপুরবাসীর অভিনন্দন পত্র প্রভৃতির কথা অতি উৎসাহের সঙ্গে তিনি বলেছেন। আজকের পাঠকের কাছে সেই উদ্ধৃত সুবিস্তৃত অংশগুলির ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া অন্য কোন মূল্য নেই।

শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ শুধু চিন্তাশীলতাতেই নয়, কর্মের কঠিন সাধনাতেও তাঁর পরিচয় রেখে গেছেন। এই কর্মবহুল জীবন কোন্ ভূমি থেকে রস সংগ্রহ করেছিল, কোথায় তার কর্মের প্রেরণা, পাঠক তার সন্ধান আত্মচরিতে পায়না। অথচ এই কর্মের জন্য যে সম্মান তিনি

পেয়েছিলেন তার হিসাবের বাহুল্য ব্যক্তিটির প্রতি আমাদের কৌতূহলকে সীমাবদ্ধ করে তোলে। নিজের কথা যে লোক বেশী বলে সে যেমন অল্পক্ষণেই অন্যলোককে উত্যক্ত করে তোলে রাজনারায়ণের আত্মচরিতও সেইরকম। যে আত্মকেন্দ্রিকতা উত্তীর্ণ না হলে আত্মচরিত সাহিত্য-পদবাচ্য হয়না রাজনারায়ণ সে আত্মকেন্দ্রিকতা উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তাঁর সমসাময়িক কালও বিশেষ স্থান অধিকার করেনি। ভাল আত্মকথায় শুধু লেখক নন, তাঁর সমাজও জীবন্ত হয়ে ওঠে। তৎকালীন জীবনযাত্রার কিছু কিছু খবর যদিও রাজনারায়ণের গ্রন্থে আছে তা নেহাৎই বিবর্ণ, বিরস। তাঁর শিক্ষার বর্ণনা প্রসঙ্গে কয়েকজন অধ্যাপকের কথা বলেছেন। সকলের সঙ্গেই তাঁর হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতার যোগ ছিল। তাঁর প্রতি তাঁদের অসীম স্নেহ ছিল সেই কথাটি কোথাও কোথাও প্রধান হয়ে উঠেছে। তাঁর পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করে 'বেঙ্গল হেরাল্ডে' যে মন্তব্য প্রকাশিত হয় তা তিনি যথাযথ তুলে দিয়েছেন। পাঠকের কাছে, অন্ততঃ সাহিত্যরসপিপাসু পাঠকদের কাছে ঐ উদ্ধৃতি মূল্যহীন।

তাঁর সহাধ্যায়ীদের যে বিবরণ আছে তা নেহাৎই বিবরণ। অনেকেরই নামোল্লেখ আছে, তাদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় দু একটা খবরও আছে। কিন্তু সেটা হিসাব লেখার মতই, ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু কোন ছাত্র উৎসাহ নিয়ে পড়বে হয়তো। কিন্তু জীবন-সন্ধানী পাঠক দেখবে যে কয়েকটী নামের সমাবেশ ঘটেছে, মানুষ ফুটে ওঠে নি। রামগোপাল ঘোষের প্রসঙ্গে রাজমহলের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন। বৃত্তান্তটি নীরস নয় কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক। পরিপূর্ণ কোন আত্মকথা বা জীবন-ব্যাখ্যায় এই বৃত্তান্তের সংযোজন নেহাৎই হাস্যকর।

কিন্তু শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা প্রসঙ্গে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের

যে চিত্রটি তুলে ধরেছেন তা কৌতূহলী পাঠকের কৌতূহল কিছুটা মেটাবে। তখনকার দিনে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে মদ্যাসক্তি ছিল প্রবল। এ সম্বন্ধে তাঁর লেখাই উদ্ধৃত করতে হয়। "তখনকার হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে কোন দোষ নাই। তখনকার কলেজের ছোকরারা মদ্যপায়ী ছিলেন বটে বেশ্যাসক্ত ছিলেন না। তাঁহাদিগের এক পুরুষ পূর্বে যুবকেরা মদ্যপান করিত না কিন্তু অতিরিক্ত বেশ্যাসক্ত ছিল। গাঁজা চরস খাইত, বুলবুলের লড়াই দেখিত, বাজি রাখিয়া ঘুড়ি উড়াইত ও বাবরি রাখিয়া মস্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পরিত। কলেজের ছোকরারা এই সকল রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনই পানাসক্ত হইতেন না যদ্যপি তাঁহারা সভ্যতার চিহ্ন এমন মনে না করিতেন।" রাজনারায়ণ অত্যধিক মদ্যপান করতেন, তাঁর পিতা ছিলেন রামমোহনের শিষ্য। রামমোহনের শিষ্যরা পরিমিত মদ্যপান করতেন। রাজনারায়ণের পিতা পুত্রকে পরিমিত মদ্যপান করানোর জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করেন তার গল্পটি চিত্তাকর্ষক।

রাজনারায়ণ ছিলেন উৎসাহী পুরুষ। জীবনে বহুকাজ তিনি নিজে উৎসাহ নিয়ে করেছেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ থেকে সুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যা কিছু করেছেন নিজের ক্ষমতায় করেছেন। পরমুখাপেক্ষী হওয়ার দুর্বলতা তাঁর চরিত্রে ছিল না। নিজের কাজের পরিচয়েই তিনি দেশের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর আত্মচরিতের অনেকটা অংশই তাঁর এই কর্মজীবনের পরিচয়। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে উপনিষদ পড়েছিলেন এবং তাঁর লেখা উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রাজনারায়ণ বাবু এই খবরটির সঙ্গে সঙ্গে একটি ফিরিস্তি দিয়েছেন কোন কোন লোকের কাছে

কি প্রশংসা ওই রচনা উপলক্ষ করে পাওয়া গিয়েছিল। অন্য কোন বাংলা জীবনী এই ধরণের আত্মপ্রচারে ভারাক্রান্ত নয়।

বক্তৃতার ক্ষেত্রেও তাই। ব্রাহ্ম সমাজে তিনি বক্তৃতা দিতে সুরু করলেন যেদিন থেকে সেদিন থেকে ব্রাহ্মসমাজে প্রীতিভাব সঞ্চারিত হলো। তাঁর বক্তৃতায় ব্রাহ্মসমাজে পরিবর্ত্তন যদি কিছু ঘটে থাকে তবে তা প্রশংসা সহকারে ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করবেন। কিন্তু নিজে তিনি যে ভাবে কৃতিত্ব দাবী করেছেন তা অত্যন্ত স্থূলরুচির পরিচায়ক হয়েছে। অহংবোধকে প্রশ্রয় না দিয়ে আত্মকথা লেখাই আত্মকথার আদর্শ। পাঠকের কাছে জীবনটাই বড়, জীবনটা যে সমকালীন প্রশংসা পেয়েছিল তা বড় নয়। সেই প্রশংসার ফিরিস্তি জীবনীকার দিতে পাবেন। তবে তাঁর পক্ষে এইটুকুই বলবার আছে যে প্রশংসাগুলির সহযোগে বিনয় সহকারে এ কথাও বলেছেন যে ঐ সব প্রশংসার উপযুক্ত তিনি নন। ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতাই যে সুন্দরতম এ কথা তিনি বলেছেন। নিজের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের এই পার্থক্য স্বীকার করে রাজনারায়ণ কিছুটা নিজের নম্রতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। আত্মপ্রচারের সুযোগ পুরোমাত্রায় নিলেও যাঁরা তাঁর চেয়ে বড় তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর মাত্রাবোধ কখনো শিথিল হয় না।

ইংরাজী ১৮৫১ থেকে ১৮৬৬ পর্যন্ত তিনি মেদিনীপুরের স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। এই পনেরো বছরে তিনি মেদিনীপুরের উন্নতি-সাধন করেছিলেন। পরবর্তী কালে মেদিনীপুরের রাজনারাণ নামেই তাঁর পরিচয় রটে গেল দেশের লোকের কাছে। শিক্ষক হওয়ার সুযোগ ও সুবিধার তিনি অপব্যয় করেন নি। যে সম্মানিত পদ তিনি পেলেন সেই পদের সকল ক্ষমতা তিনি দেশের কল্যাণের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের

সবচেয়ে বড় গৌরবের যুগ মেদিনীপুরের শিক্ষকতার কাল। মেদিনীপুর স্কুল যেমন তাঁর হাতে নব জীবন লাভ করলো, তেমনি নূতন প্রাণ পেলো ব্রাহ্মসমাজ। নূতন করে তৈরী হলো সুরাপান-নিবারণী সভা। সমগ্রভাবে বাংলাদেশে জাতীয়তার জোয়ার এলো ১৯০৫ সালে। তার অর্দ্ধশতাব্দী আগে রাজনারায়ণ মেদিনীপুর জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভা স্থাপন করেন। জাতীয়তার প্রথম দীক্ষাগুরুদের মধ্যে রাজনারায়ণ অন্যতম।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁকে মেদিনীপুর ছেড়ে যেতে হয়। মেদিনীপুরে থাকার সময় এবং ছেড়ে যাবার পরে যে সব কাজের ভার তাঁকে নিতে হয় তাতে তাঁর অসম সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যভাষণ যত নিষ্ঠুরই হোক তিনি তা থেকে কখনো বিরত হতেন না। কেশবচন্দ্রের ভক্তবৃন্দেরা মানুষকে অবতার বানিয়ে তুললেন; রাজনারায়ণ তৎক্ষণাৎ তার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন। ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার মাত্র এই কথা বলে তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করাব চেষ্টা সুরু করলেন। কিন্তু এই জীবনের পরিচয় দিতে গিয়েও শ্রদ্ধেয় রাজনারাযণ ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন নি। সেই আত্মবিজ্ঞপ্তি পাতায় পাতায়। নানা লোকের নানা প্রশংসাপত্র জুড়ে জুড়ে আত্মপ্রসাদ লাভের প্রচেষ্টা রসজ্ঞ পাঠক মাত্রকেই পীড়া দেয়। মেদিনীপুর ছেড়ে কোথাও যেতে চাইতেন না তিনি। ভাল ভাল কাজ তাঁর পাবার সুযোগ ঘটেছিল, কিন্তু মেদিনীপুরের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ তাঁকে মেদিনীপুর ছেড়ে যেতে দেয়নি কোথাও। কর্ত্তব্যের প্রতি এই সততা, এই একনিষ্ঠতা তাঁর জীবনকে এক অপূর্ব দীপ্তিতে আলোকিত করেছে।

মনীষী রাজনারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে দেবেন্দ্রনাথের প্রতি যেমন

অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মধুসূদনের প্রতি তাঁর স্নেহ তেমনি সহজেই ফুটে উঠেছে। রাজনারায়ণের স্বভাবের এই গুণটি পাঠককে মুগ্ধ করবে। নিজেকে প্রচার করার প্রচেষ্টা থাকলেও অন্যের যথার্থ মূল্য দিতে তিনি কুণ্ঠিত নন। দেবেন্দ্রনাথ সাহেবদের কোনদিন তোষামোদ করেন নি সে কথা সশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করেছেন রাজনারায়ণ। খৃষ্টান জ্ঞানেন্দ্র-মোহনের সঙ্গে বহু মতানৈক্য সত্ত্বেও তাঁর স্নেহের সম্পর্ক শিথিল হয়নি একটুও।

কর্মজীবনের শেষাংশে সমাজের দু একটি ঘটনা আছে, যে ঘটনাগুলি তাঁর জীবনের বিকাশের সঙ্গে যুক্ত না হলেও ঐতিহাসিকের বিচারে মূল্যবান। মনীষী রাজনারায়ণের আত্মচরিত সুখপাঠ্য গ্রন্থ নয়, তবুও মাঝে মাঝে যেখানে ব্যক্তি হৃদয়ের স্পর্শ লেগেছে সেখানে পাঠকের মন খুসী হয়। অনেক কাজ তিনি করেছেন, অনেক লেখা তিনি লিখেছেন, তার খবর যা আত্মচরিতে আছে তা পূর্ণাঙ্গ নয়। আত্মচরিত রচনার পরে তিনি আরও ১৫ বছর বেঁচে ছিলেন। পরবর্তী কালে আর কোন নূতন যোজনা তিনি করেন নি। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯৯ খৃঃ-এ। আত্মচরিতের প্রথম প্রকাশ ১৯০৯ খৃঃ-এ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত'

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম। বাংলাদেশে তখন জীবন্ত প্রাণবান মানুষের মেলা বসে গেছে। খ্যাত অখ্যাত কত যে সত্যিকার যোদ্ধা সেদিন কুসংস্কারের জঞ্জালস্তূপ সরিয়ে জাতীয় জীবনের স্রোতকে অবারিত, মুক্তগতিতে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তার শেষ নেই। সে যুগটাই ছিল যুদ্ধঘোষণার যুগ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে তাঁদের দৃপ্ত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। নূতন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার দিন সুরু হয়েছিল। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে যারা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন অসম সাহসী; যুক্তি ও জ্ঞানের আলোয় তাঁরা জীবনের যে নূতন দৃষ্টি লাভ করেছিলেন তাকে শুধু স্বপ্নবস্তু করেই রাখেন নি। তাকে কার্যকরী করার জন্য তাঁরা সর্বস্বপণ করেছিলেন। নির্ভীক নিষ্কলুষ চরিত্র সেই সব মহাবীর্যবান পুরুষেরা সেদিন সবল মুষ্টিতে যা জীর্ণ, যা শুষ্ক তাকে ধরে নাড়া দিয়েছিলেন আর নূতন সৃষ্টির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁদের সততা, মননশীলতা চিরকালের মানুষের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে।

এই যুগের পরিবেশে শিবনাথশাস্ত্রীর জীবন বিকশিত হয়েছে। রক্ষণশীল আদর্শবাদী পরিবারের দৃঢ়চরিত্র অথচ স্নেহশীল পিতামাতার সন্তান শিবনাথ শাস্ত্রী। নূতন যুগের নূতন আদর্শে বিশ্বাসবান কর্মীলোক তিনি। কত যে দুঃখ এসেছে তার শেষ নেই, মনে মনে কত যে সংগ্রাম করেছেন নিজের সঙ্গে, তবু যা সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন তার জন্য কোনদিনই ভয়, সংশয় বা দ্বিধার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি।

যারা ছিল অত্যন্ত নিকট বন্ধু, কর্তব্যবোধে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে এসেছেন, যে কেশবচন্দ্রের প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা সত্যরক্ষার জন্য তাঁকে ছেড়ে অন্য ব্রাহ্মসমাজ তৈরী করতে তিনি দেরী করেন নি একটুও। কিন্তু এত সংঘাতেও তাঁর মনের শান্তি নষ্ট হয়নি। সমস্ত জীবনের যত কিছু সাফল্য আর ব্যর্থতা, বন্ধুত্ব আর শত্রুতার কাহিনী আশ্চর্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তিনি বর্ণনা করেছেন। ঐ ঝোড়ো হাওয়ার যুগে তিনি যে ধৈর্য ও প্রশান্তিকে তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্বের মূলকথা করেছিলেন তা তাঁর আত্মচরিত পড়লে সহজেই বোঝা যায়।

আত্মবিশ্লেষণ বলতে যা বোঝায় শিবনাথ শাস্ত্রী নিজের আত্মচরিতের মধ্যে তা করার চেষ্টা করেন নি কোথাও। যে অর্থে রুসো বা গান্ধীজীর আত্মজীবনী আত্মবিশ্লেষণমূলক সে অর্থে তাঁর 'আত্মচরিত' নিশ্চয়ই আত্মবিশ্লেষণমূলক নয়। কোথাও কোথাও অতি সহজ ভাবে নিজের মানসিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সরল স্বচ্ছ দুএকটি ভাব-বিকাশের বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই তা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনার বিবরণের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করার দুর্লভ শক্তির অধিকারী ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। তাঁর আত্মচরিত শুধু তাঁর কথাই নয় এ যেন সমস্ত যুগের মর্মকথাটি ফুটিয়ে তুলেছে। নিজেকে তিনি কোথাও জোর করে প্রবল করে তুলতে চাননি। ঘটনার স্রোতে চলেছেন তার সুনিপুণ বিবরণ দিয়ে গেছেন সঙ্গে সঙ্গে। সেই যুগের কত নিয়মভাঙ্গা দুঃসাহসী বীর তাঁর এই কাহিনীর মধ্যে এসে পড়েছেন। তাঁদের কাউকে নিজের চেয়ে কম সততার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন নি।

মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করা যদি আত্মজীবনীর কাজ হয় তবে 'আত্মচরিত' যে সার্থক গ্রন্থ এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। আত্মচরিত পড়ামাত্রই মনে হয়েছে এর মধ্যে অসততার লেশমাত্র স্পর্শ

নেই। যে বিরাট ঔদার্য নিয়ে তিনি জীবনের রাজপথে চলেছিলেন তার অজস্রদান অকৃপণ ধারায় তাঁর ভিন্নমতাবলম্বীদের উপরও ঝরে পড়েছে। নিজের দুর্বলতাগুলি কোথাও তিনি ঢেকে রাখতে চাননি, ঢেকে রাখেনও নি। কারুর গুণের সমাদরে তাঁর কখনো ক্লান্তি দেখা দেয়নি। লিখন পদ্ধতির মধ্য দিয়েই ব্যক্তিটি ধরা পড়েছেন।

'আত্মচরিতে'র প্রধানতম গুণ তার প্রসাদগুণ। গল্পের ধারা সুললিত ভঙ্গীতে অধ্যায়ের পর অধ্যায় পার হয়ে চলেছে সাহিত্যরচনার প্রচেষ্টা কোথাও প্রবল হয়ে সেই ধারাকে ব্যাহত করেনি। পাঠকের মনের মধ্যে একসঙ্গে তৃপ্ত হয় সাহিত্য পিপাসা, ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসা আর সমাজ জিজ্ঞাসা। জীবনে যখন কোন ঘটনা ঘটে তখন সেই ঘটনা তার সমস্ত ক্রূর বীভৎস কদর্যতা নিয়েই আমাদের সামনে আসে। তখন আমরা সাময়িক ভাবপ্রবণতার উত্তাপ নিয়েই তার বিচার করি। কিন্তু যখন সেই সব ঘটনা সুদূর অতীতের বস্তু হয়ে দাঁড়ায় তখন অনেক শান্ত অনেক স্থিরভাবে আমরা তাদের পুনর্বিচার করতে পারি। সেই পুনর্বিচারের আনন্দেই অধিকাংশ আত্মজীবনীর জন্ম।

শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে সন তারিখের নির্ভুল হিসাব সর্বত্র নেই। ইচ্ছাকৃত গোলযোগ ঘটানো আর তা দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য-সাধনের চেষ্টা তাঁর মত লোকের পক্ষে অসম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি বলেছেন যে বোধহয় ঠিকমতো সন তারিখের নির্ণয় তিনি করতে পারছেন না। যেমন—

"অতঃপর উপেন্দ্রনাথ দাসের বিধবাবিবাহের বিবরণ লিখিতেছি। এই ঘটনাটি বোধহয় ১৮৬৮ সালের মধ্যভাগে ঘটিয়াছিল।"

"বোধহয় ১৮৬৮ সালের জানুয়ারীর শেষভাগে পরীক্ষার ফল বাহির হইল।"

"বোধহয় ১৮৬০ সালের মধ্যভাগে উপেনের প্রথমা স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যু হইল।"

কিন্তু গ্রন্থের শেষভাগে তিনি শুধু সন নয় নির্দিষ্ট তারিখটি পর্যন্ত দিয়েছেন। প্রথম অংশ থেকে ছাত্রজীবনের শেষ পর্যন্ত অনেকটাই স্মৃতির উপর নির্ভর করেছেন, কিন্তু শেষাংশের লেখাটা নানা লিখিত উপকরণের সাহায্যে লিখেছেন বলেই মনে হয়, তাই প্রত্যেকটি ছোটখাটো ব্যাপারেও সঠিক তারিখ পর্যন্ত দিতে পেরেছেন।

সংসারে আমরা যাদের রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় বলে জানি তারা ছাড়াও এমন অনেক লোক আমাদের জীবনে আসে যারা তাদের অল্পদিনের পরিচয়ে স্নেহ ভালবাসার যে অর্ঘ আর দাবী আনে তা মোটেই তুচ্ছ নয়। পথচলতি জীবনে যাদের সঙ্গে এমনি করে নানা উপলক্ষ্যে দেখা হয়ে যায়, আবার যারা দুদিনের এই পরিচয় সঙ্গে করে যেমন সহজে আসে তেমনি সহজেই চলে যায়, তাদের স্মৃতির বিচিত্রবর্ণ চিত্র আমাদের মনের স্মৃতিমঞ্জুষা ভরে থাকে। কত তুচ্ছ আলাপ, ছোটখাটো কত ঘটনার টুকরো যে মনের অবচেতনে জড়ো হতে থাকে তার শেষ নেই। কেউ আসে হাসি-আনন্দের ঝরণাধারা বেয়ে, কেউ আসে চোখের জলে অবকাশ মুহূর্তগুলোকে ভিজিয়ে দিয়ে। প্রত্যেকটি আত্মজীবনীতে এই ধরণের অখ্যাত অজানিত চরিত্র ভাড় করে আসে আর ঐ আত্মজীবনীর সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে সোজা চলে যায় পাঠক সমাজের অন্তরের গভীরে। শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক। সেই খ্যাতি তাঁর সারাদেশে সেদিন বিস্তৃত। কর্মজটিল সেই জীবনে শুধু যে নীরস সাধনা চলেছে তা নয়, সেই কর্ম-স্রোত কত সাধারণ লোকের জীবনের সঙ্গে তাঁর যোগ ঘটিয়েছে তার শেষ নেই। বাংলা

সাহিত্যে বা বাঙ্গালীর জীবনে তাদের কোন মূল্য নেই কিন্তু সেই লোকগুলির কথা সবিস্তারে না বল্‌লে লেখকেরও নিজেকে প্রকাশ করা হয় না। নিজের কর্মজীবনটুকুই তাঁর কাছে জীবনের সমস্ত পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়নি, যাঁদের মধ্যে তাঁর মন আপন বিস্তার খুঁজে পেয়েছে তারা তাঁর অন্তরের আত্মীয় হয়ে দাঁড়য়েছে। এইভাবে অখ্যাত অজ্ঞাত বহু ছোটখাটো চরিত্র এই আত্মজীবনীকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের আসরে জায়গা জুড়ে বসে এবং পাঠকসমাজের মনে ঐ অল্প আয়তনেই একটা ছাপ রেখে যায়।

অনেক ছোটবেলায় একটি সুন্দর ফুটফুটে গৌরবর্ণ মেয়ে তার মাসীর কাছে আসতো। সেই মাসীর বাড়ী শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়ীর পাশেই ছিল। সেই মেয়েটি তাঁর অল্প বয়সের খেলার সঙ্গিনী। স্কুলের সময় শেষ হলে, "তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া একটু খেলা করিয়া আসিতাম।" অনেককাল পরে যখন সেই সঙ্গিনীকে আবার দেখলেন তখন "সে প্রস্ফুটিত পুষ্পসম কান্তি বিলীন হইয়াছে, সন্তানভারে ও সংসারভারে সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।" তখন তার কথা মনে করে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর 'অবলাবান্ধব পত্রিকা'য় "তুমি কি আমার সে খেলার সঙ্গিনী" নাম দিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। এই যে শিশুজীবনের ভালবাসা এতো জীবনী-কারের পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব হতো না। মনের মধ্যে ছোটোখাটো টুকরো টুকরো ভাবনা চিন্তার যে তরঙ্গ ওঠে তা বাইরে দাঁড়িয়ে জীবনীকারের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য। কিন্তু আত্মজীবনীর মাধ্যমে এই যে বিশেষ বিশেষ সুরগুলি নানা তুচ্ছ কারণে বেজে ওঠে, তাদের অনুরণন অনুভব করা যায়। যেমন করে ওই সুন্দর ফুটফুটে গৌরবর্ণ মেয়েটি জীবনে এসেছিল, তেমনি আরও অনেকেই এসেছে।

শাঁখারীটোলার জগৎবাবুর পত্নী ঠিক ঐ ভাবেই স্মৃতির সূত্র ধরে

এসেছেন। তাঁর অজস্র স্নেহ অযাচিত ভাবে লেখকের উপর বর্ষিত হয়েছিল। তিনি লেখককে 'কঠিন ছেলে' বলে তিরস্কার করতেন, এটা-ওটা খাওয়াতেন, ঘরকন্নার কথা বলতেন। সেই মাসীর অজস্র অকৃপণ স্নেহধারাকে স্মরণ করে লেখক বলেছেন "এখন ভাবিয়া দেখি, মাসী যে আমাকে 'কঠিন ছেলে' বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলিয়াছিলেন। আমি মানুষের নিকট যতটা প্রেম পাইয়াছি ততটা প্রেম দিতে পারি নাই।"

এমনি করে কত মায়ের আদর, কত বোনের স্নেহ, কত অপরিচিতের উদ্বেগ তাঁর জীবনের ক্ষেত্রকে শ্যামল সরস করে রেখেছে তার হিসাব তিনি দিতে কোথাও কুণ্ঠিত হননি। ভৃত্য আর দাসীরা তাকে কেমন করে শ্রদ্ধা আর সেবা দিয়ে মন জয় করেছিল তারও গল্প অনেক আছে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতিতে'ও দাসতন্ত্রের কথা আছে, অবনীন্দ্রনাথের লেখাতেও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর ভৃত্যদের আসর জমেছে। দাস-দাসীদের ঘরের লোকের মতন করে উল্লেখ করা আমাদের বাংলা-সাহিত্যের আত্মজীবনীগুলির একটা সাধারণ ঘটনা।

এই সাধারণ মানুষেরা যেমন একদিকে নিকট আত্মীয়তার একটা মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে লেখক এবং পাঠকদের সঙ্গেও, অন্যদিকে তেমনি মহাপুরুষ প্রসঙ্গও এই সব আত্মজীবনীগুলিকে একটা বিশেষ সরসতা ও গভীরতা দান করে। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ বিশেষ চিত্তাকর্ষক। শুধু যে লেখক কি পরিমাণে শ্রদ্ধা করতেন তাই নয়, তাঁর দৃষ্টিতে এঁরা কেমন করে ধরা দিয়েছিলেন তাও আমাদের চোখে পড়ে। ব্যক্তিগত পরিচয়ের ফলে এই মহা-মানবদের যে রূপটি লেখক অত্যন্ত কাছে থেকে দেখেছিলেন তারই একটা সহজ ছবি আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

কিন্তু মহাপুরুষই হোন আর সাধারণ মানুষই হোন, তাঁদের কথা বলে লেখকের আনন্দের অন্ত নেই। আত্মজীবনী লিখতে বসে যখন ধীরে ধীরে বিগত দিনের নানা চেনা মুখের ছবি মনে পড়েছে তখন লেখকের কী গভীর আনন্দেই না মন ভরে উঠেছে। সেই আনন্দই লেখকের আত্মজীবনী লেখার চরম পুরস্কার।

শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে তিনি কোন প্রসঙ্গ বলতে সুরু করলেই সঙ্গে সঙ্গে একরকম গল্প যতো আছে সবই বলে দেন। তখনকার দিনের লোকেদের বোধহয় মানসিক গঠনই এইরকম ছিল। কোন মহত্ত্বের প্রকাশ, কোন সৎকাজের সংগঠন দেখলেই তাঁরা স্মৃতিভাণ্ডার উজাড় করে ফেলতেন, ঐ রকমের মহত্ত্ব আর ঐ ধরণের সৎকাজের গল্প বলে। তাঁর এই পদ্ধতি দেখে মনে হয় যে গল্পবলার সহজ রীতিতেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করে আনন্দ পেয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দার মধ্যভাগ থেকে সুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ বছর তাঁর জীবনকাল বিস্তৃত। ১৯০৭ সাল পর্যন্ত তাঁর আত্মকথা তিনি বলেছেন। এই সুদীর্ঘ জীবনে নানাদুঃখ, নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সেই সুখেদুঃখে-হাসিকান্নায় সুর-বাঁধা জীবনের যে বিচিত্র ইতিহাস তারই নাম আত্মচরিত। যারা আনন্দ দিয়েছে, যারা জীবনকে মধুর করেছে তাদের যেমন ভালবেসে ঠাঁই দিয়েছেন তেমনি যারা দুঃখ দিয়েছে, যারা শত্রুতা করেছে তাদের সম্বন্ধেও আশ্চর্য সহনশীলতা দেখিয়েছেন। যে মতবাদ বুদ্ধি ও বিবেচনায় সত্য বলে মনে হয়েছে তার জন্য কোন ত্যাগই তাঁর কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে পাঠককে ভাবতে হয় কি আশ্চর্য গুণের সমন্বয় তাঁর মধ্যে ঘটেছিল। একদিকে যেমন গভীর স্নেহ-

মমতা তাঁর চরিত্রকে কোমলতা দিয়েছিল তেমনি অন্যদিকে আদর্শের প্রতি অচঞ্চল নিষ্ঠা ও মানসিক স্থৈর্য তাঁর চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ আদর্শবাদী চরিত্র করে তুলেছিল। সেই যুগটাই যেন ছিল গোটা মানুষের যুগ, জীবনের পরিপূর্ণ অখণ্ড ধারণা তাঁদের শুধু মনেই ছিল না, সমস্ত ব্যক্তিত্বেও প্রকাশ পেতো। পিতার মতামতের বিরুদ্ধে পৈতা পরিত্যাগ করেছিলেন, যাঁকে অশেষ শ্রদ্ধা করতেন সেই কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ ও সংগঠন গড়ে তুলতে দ্বিধা করেন নি একটুও।

ব্রাহ্মসমাজের সেই জটিল সংঘাতের যুগে শিবনাথ শাস্ত্রীর সর্বজনমান্য ব্যক্তিত্ব যে অনেক অকারণ বিদ্বেষ ও কুৎসা রটনা বন্ধ করেছিল সে কথা আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। বাংলার সেই নবজাগরণের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন শিবনাথ শাস্ত্রী সুদীর্ঘকাল বাংলার জাতীয় জীবনে, শিক্ষিত সমাজে কি গভীর শ্রদ্ধা পেয়েছেন। ব্রাহ্মধর্মের নেতারা তখন সকলেই জীবিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তখন ব্রাহ্মমতাদর্শের সর্ববাদীসম্মত নেতা। এঁদের জীবন কালেই ব্রাহ্মধর্মের নানাবিভাগ সুরু হলো। যে ব্রহ্ম উপাসনার ধারণা নিয়ে রামমোহন ব্রহ্মসভা সুরু করেছিলেন সে উপাসনা নেহাৎই যান্ত্রিক হয়ে যেতে লাগলো দিনে দিনে। কত যে নূতন নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হলো, কত যে উপাসনা হতে লাগলো তার শেষ নেই, কিন্তু 'আত্মচরিত' পড়ে এই কথাই মনে হয় যে, কয়েকজন লোকের জীবন ছাড়া সেদিন ব্রাহ্মধর্মের আর কোন প্রাণস্পর্শী আবেদন ছিল না। তখন উপাসনার বেদীর দখল নিয়ে মারামারি সুরু হয়েছে, কেশবচন্দ্র পুলিশপ্রহরায় উপাসনা করতে আসছেন, নববিধান ও সাধারণ সমাজের মুখপত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ করছে, ঠিক যেমন করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যান্ত্রিকভাবে একে অন্যের সমালোচনা করে

তেমনি নববিধান ও সাধারণ সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে তখন। কেশবচন্দ্রের মত বিরাট ব্যক্তিত্ব যখন নিজের তৈরী আন্দোলনের মূলোচ্ছেদ করলেন তাঁর নিজের কন্যার বারো বছরের আগে বিয়ে দিয়ে, তখনই এই বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ালো। আর এক সংঘাতও প্রবল হয়ে দেখা দিল। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী আর দুর্গামোহন দাসের নেতৃত্বে স্ত্রী-স্বাধীনতার দল প্রবল হয়ে দাঁড়ালো এই সময়। ব্রাহ্ম-সমাজের মহিলা সভ্যদের পর্দার বাইরে বসার সুযোগ করে দিতে হবে এই দাবী প্রথমে কেশবচন্দ্র মানতে পারেননি। তখনই আপোষবিরোধী স্ত্রী-স্বাধীনতার দল মন্দিরে গিয়ে উপাসনায় যোগ দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। অবশ্য পরে যখন সমাজে মেয়েদের পর্দার বাইরে বসার রেওয়াজ হলো তখন ঐ স্ত্রী-স্বাধীনতার দল আবার ফিরে এলেন। এমনি যখন অবস্থা তখন পরস্পরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রক্ষা করে কাজ করা সোজা নয়। দেবেন্দ্রনাথ ছাড়া তখনকার দিনে শিবনাথ শাস্ত্রীই বোধহয় একমাত্র সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা ছিলেন ব্রাহ্ম-জনমণ্ডলীর।

তাঁর এই কর্মময় জীবনের ইতিবৃত্ত থেকে একটি কথা উদ্ধার করা শক্ত হয় না। সেটি হলো এই যে তখনকার দিনে এই ধর্মকেন্দ্রিক দলায় সংঘাত অত্যন্ত সংগঠিত উপায়েই চলতো। তাঁরা সমষ্টিগত প্রচার কার্যের মূল্য বুঝেছিলেন, উপাসনা ছাড়া প্রকাশ্য বক্তৃতা, পত্রিকা প্রকাশ এ সব পদ্ধতি তাঁরা অত্যন্ত সুষ্ঠু ভাবেই আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য নিজস্ব উপাসনা গৃহ, নিজস্ব প্রেস, এ সকলের প্রয়োজনীয়তা তাঁদের বুঝতে দেরী হয়নি। অন্যান্য সামাজিক হিতকার্যের মতো তখনই তাঁরা চাঁদার বই নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। কিন্তু এই নিয়মমাফিক

প্রচারকার্যের প্রধান অংশ গ্রহণ করেও শিবনাথ শাস্ত্রী যে তাঁর জীবনে কোথাও যান্ত্রিক হয়ে যাননি তার অজস্র প্রমাণ সারা বইখানি-তেই ছড়িয়ে আছে। চুরি করে বিধবা বিবাহ দেওয়ার রোমান্টিক চঞ্চলতা তাঁর ছিল; পিতামাতার আদেশের বিরুদ্ধে সেই বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন যে বন্ধু তাঁরই ভরসায় বিধবা বিবাহ করেছেন।

কয়েকটি চরিত্রকে বিশেষ করে না জানলে শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী বোঝা হবে না। সেই চরিত্রগুলির বলিষ্ঠতা শুধু তাঁকেই তৈরী করেনি, তাঁদেরই মধ্য দিয়ে সেদিনকার যুগের আদর্শনিষ্ঠ, সব ত্যাগী নির্ভীক মানুষগুলির ছায়া পড়েছে।

যাঁর প্রভাব তাঁর সমস্ত জীবনকে সত্যসন্ধী করে তুলেছে, তিনি হলেন তাঁর বড়মামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। তখনকার কালের লোকেদের সাধারণতঃ যে আদর্শনিষ্ঠা থাকতো তা তো তাঁর ছিলই, উপরন্তু আর একটা বড় জিনিষ তাঁর ছিল সেটা হলো এই যে নিজের আদর্শ তিনি কখনো কারুর উপর জোর করে চাপিয়ে দেননি। বিরাট সমুদ্রের মতো প্রশান্ত উদার মন ছিল তাঁর আর তেমনি ছিল অদম্য সাহস। আজকের বাংলাদেশ 'সোমপ্রকাশে'র বিদ্যাভূষণকে ভুলে গেছে যেমন করে আরও অনেক প্রাতঃস্মরণীয় লোককে ভুলেছে। এই একটি লোকের প্রসঙ্গ আলোচনা করলেই আমরা বুঝবো কি ধরণের লোকের আদর্শ সামনে রেখে শিবনাথ শাস্ত্রী নিজেকে গড়ে তোলবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

স্কুল ইনস্‌পেক্টার উড্রোসাহেব চটিজুতা পরা লোককে ঘরে ঢুকতে দিতে চাইতেন না। তাঁরই ঘরে চিঠি পৌছে দিতে ঢুকলেন শিবনাথ চটি পরে। উড্রো সাহেব বললেন যে চটিপায়ে ঘরে ঢুকে শিবনাথ

তাঁকে অপমান করেছেন সুতরাং ও চিঠি তিনি নেবেন না। শিবনাথ কিন্তু চটি খুল্‌লেন না, তিনি বল্‌লেন, "এই কাগজ আপনার ডেস্কের উপর রইলো। ও আপনাদেরই কাগজ, নেন নেবেন, না নেন, না নেবেন। আমার কাজ আমি করে গেলাম।" মাতুল দ্বারকানাথ ডেকে পাঠিয়ে সব বৃত্তান্ত শুনলেন আর বল্‌লেন, "উড্রো সাহেব তোমাকে জুতা খোলাইতে পারেন নাই ইহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার ভাগিনার মতো কাজ করিয়াছ।" মাতুল দ্বারকানাথ যে শিবনাথের আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন এ বিষয়ে এই একটি ঘটনার সাক্ষ্য যথেষ্ট।

বিপত্নীক বন্ধু যোগেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহালক্ষ্মী নামে এক বিধবার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি নিজেই উৎসাহী হয়ে। সেই বিবাহ-ব্যাপারের সমুদয় ব্যয় বহন করলেন বিদ্যাসাগর। আত্মীয়স্বজন তাড়িত যোগেন্দ্রনাথ যখন অসহায় হয়ে পড়লেন তখন শিবনাথ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। কিন্তু অচিরকালেই পিতার পত্র পেলেন যেন ঐ দম্পতীর সঙ্গে কোন সংযোগ তাঁর না থাকে। মনের ভিতর নূতন দ্বন্দ্ব সুরু হলো, পিতৃ-আদেশ না কর্তব্য। সেই সংকটের মুহূর্তে মাতুল দ্বারকানাথ বল্‌লেন "না তুমি তাহাকে ত্যাগ করিতে পার না। তুমি তাহাদিগকে বিবাহে উৎসাহ দিয়া বিপদের সময় যদি তাহাদের পরিত্যাগ করো তাহা হইলে অধমের কাজ হইবে, কাপুরুষতা হইবে, আমার ভাগিনার মতো কার্য হইবে না।" এমনি কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন দ্বারকানাথ,—লোক-ভয়ের অপদেবতা কোনদিন তাঁকে কর্তব্যের কঠিন পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি।

শিবনাথের পিতা যা সত্য মনে করতেন তা করতেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু দ্বারকানাথের মত মনের ঔদার্য ছিল না তাঁর। যখন স্ত্রীশিক্ষার

ব্যাপক প্রচলন হয়নি দেশে তখন তিনি নিজের মেয়েদের মেয়েস্কুলে পড়িয়েছেন। ছেলে যেদিন থেকে ব্রাহ্ম হলো সেদিন থেকে তাঁর মুখদর্শন করবেন না ঠিক করেছিলেন। ছেলের অর্থসাহায্য কোনদিন গ্রহণ করেন নি। কিন্তু যেদিন অসুস্থ পীড়িত পুত্রের কাতর আহ্বান এলো সেদিন গহনা বন্ধক দিয়ে ছুটে এলেন সেই পুত্রের কাছে। মুখদর্শন করলেন না পুত্রের কিন্তু স্ত্রীকে রেখে এলেন পুত্রের কাছে, গ্রামের জ্ঞাতিকুটুম্ব যখন একঘরে করার ভয় দেখালো, "বাবা তখন বজ্রের ন্যায় কঠোর হইয়া দাঁড়াইলেন। একঘরে করে করুক, আমার কর্তব্য কাজ আমি করেছি বলিয়া সে দলাদলির প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিলেন না।" এমনি সব মানুষ শিবনাথের মনের মাটি গড়েছিলেন। সেই ভূমির উপর সবল সতেজ প্রাণবন্ত দেশনেতা শিবনাথের বিকাশ ঘটবে এতে আর আশ্চর্য কি!

আত্মচরিত লিখতে বসে তিনি যে কতবার মেয়েদের স্নেহ ভালবাসার কথা উল্লেখ করেছেন তার শেষ নেই। নানা অবস্থার ঘরের মেয়েদের কাছ থেকে যে অযাচিত ভালবাসা পেয়েছেন তার জন্য তাঁর নারী জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। কর্মবীর শিবনাথের অন্তরে যে একটি স্নেহকোমল হৃদয় ছিল তা বারবার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে মেয়েদের ভালবাসার স্পর্শ পেয়ে। মাতৃ স্নেহের প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর এক ঝি ছিল। ঘৃণিত পতিতাবৃত্তি ছেড়ে সে এসেছিল তাঁর দাসীবৃত্তি করতে। সে তাঁর মাকেও বলতো কি রান্না তাঁর জন্য করতে হবে। শিবনাথকে সে ডাকতো 'ভালমানুষ বাবু' বলে। তাঁর সম্বন্ধে শিবনাথ বলেছেন "সাধে কি আমি নারীজাতিকে ভালবাসি। যে পাপে ডুবিয়াছিল, পাপ যার দৈনিক আচরণ হইয়াছিল তাহারও হৃদয়ে এই প্রেমের শক্তি তাহারও এই কৃতজ্ঞতা।" বর্ধমানে যখন

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে গেলেন তখন জমিদারদের বিরুদ্ধতায় কেউ কোন জিনিষ বিক্রী করে না। অথচ কাদের গোপন হস্ত প্রতিদিন তাঁদের খাদ্যসামগ্রী যুগিয়ে গেছে। যখন ফিরে আসেন তখন "পরে শুনিয়াছি যে, জমিদারগণ আমাদের খাওয়া বন্ধ করিতেছেন শুনিয়া গ্রামের নারীগণ দয়া করিয়া গোপনে গোপনে আমার খাবার পাঠাইতেছিলেন। সাধে আমি নারীকুলের এত গোঁড়া।

শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যের একটি অতি সুখপাঠ্য বই। শুধু সুখপাঠ্য নয়, জীবনের গভীরতম মূল্যগুলি জানতে হলে এ বই অবশ্যপাঠ্য। পাণ্ডিত্যের লেশমাত্র অহংকার তাঁকে স্পর্শ করেনি, কোন উন্নাসিকতা তাঁর চরিত্রের শুভ্রতায় বিন্দুমাত্র ছায়া ফেলেনি। তাঁর নিষ্কলুষ পবিত্র চরিত্রের মতোই তাঁর আত্মজীবনী। বাংলা সাহিত্যের অন্য কোন আত্মজীবনীর লেখক বোধহয় নিজেকে এমন করে আর উজাড় করে দেননি। শুধু যে নিজের কথা নিজেই বলে শেষ করেছেন তা নয়, তাঁর বলবার ভঙ্গীই তাঁকে ফুটিয়ে তুলেছে।

—

কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'আত্মচরিত'

'সঞ্জীবনী'র সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য দেশ নেতাদের মত প্রখ্যাতি লাভ করেন নি। সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন তখন বাংলার নেতা, শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের নেতা, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে তখন চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে, সেই সময়ে কৃষ্ণকুমার তাঁর 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা প্রচার ও প্রকাশ করে দেশের সাধনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছিলেন খাঁটি ব্রাহ্ম, তখনকার স্বদেশী মনোভাবে তিনি অনুপ্রাণিত। লোভ তাঁর চরিত্রকে স্পর্শ করেনি, ভয়ে তাঁর উন্নত শির অবনমিত হয়নি কখনো। নিজের বিচারবুদ্ধির অনুশাসনের সোজা পথ দিয়ে তিনি সবল জীবন যাপন করে গেছেন। কখনো ভাবেননি মান-সম্মানের কথা, লোক-ভয়কে তুচ্ছ করেছেন চিরকাল। আজকের বাংলা-দেশ তাঁকে মনে রাখেনি যেমন করে আরও অনেককেই মনে রাখেনি।

কৃষ্ণকুমারের 'আত্মচরিত' ইতিহাস হিসাবে মূল্যবান; স্বদেশী যুগের বহু খবর তাতে পাওয়া যাবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার অনেক তথ্য সেখানে পাওয়া যাবে। কিন্তু নিজের জীবনের বিকাশ, নিজের বুদ্ধি ও বোধের ক্রমপরিণতির বর্ণনা বেশী নেই। তিনি ছিলেন স্বভাবতঃ সাংবাদিক। সংবাদ বিতরণে তাঁর ছিল আশ্চর্য দক্ষতা। পড়তে পড়তে উপন্যাসের মত পাঠকের কৌতূহল গভীরতর হতে থাকে। কিন্তু সেই ঘটনাস্রোতের মধ্যে একটি লোকের বিকাশ

দেখানোর অতি প্রযোজনীয় কাজটি তিনি করেন নি। তাঁর বাল্যকথা, তাঁর ছাত্রজীবন, তাঁর পারিবারিক জীবন, তাঁর ধর্ম ও রাজনৈতিক কার্য-কলাপ সবই ঘটনাগত দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন। তাঁর আত্মচরিত আত্মজীবনী হয়নি, কৃষ্ণকুমার মিত্রের জীবনী হয়ে গেছে। পরি-প্রেক্ষিতেব বর্ণনা অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবেই আছে, জীবনের বর্ণনা নেই। তাই আত্মচবিত হিসাবে কৃষ্ণকুমারের রচনা সার্থক হয়েছে এ কথা বলায় তর্কের অবকাশ থাকবে।

সত্যেন্দ্রনাথের 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস'

সত্যেন্দ্রনাথের 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস'কে আত্মজীবনীর পর্যায়ে ফেলা একটু শক্ত। নানা লোকের চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের আভাস বহন করে এক একটি চিত্র ফোটানো হয়েছে। পড়তে পড়তে পাঠক মুগ্ধ হয়ে যায়। সেই বিগত দিনের বাংলাদেশের জননায়কদের জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে সত্যেন্দ্রনাথের লেখায়। দ্বারকানাথ, ম্যাক্সমূলার, দেবেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ, নবগোপাল মিত্র, তারকপালিত, মনোমোহন ঘোষ ইত্যাদির অতি স্বল্প অথচ জীবন্ত পরিচয় সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যকথায় আছে। সত্যেন্দ্রনাথের নিজের জীবনাংশ অত্যন্ত তুচ্ছ স্থান পেয়েছে, বড় হয়েছে যে সব প্রাণবান পুরুষদের সঙ্গ পেয়েছেন তাঁদের স্মৃতিকথা। তাই এ তাঁর আত্মজীবনী নয়, বরং স্মৃতিকথা বললে খানিকটা সুবিচার হতে পারে। এই ধরণের চরিত্রচিত্র রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতিতে'ও দুতিনটি আছে। পরবর্তী কালে নানা লেখক প্রখ্যাত পুরুষদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ের কাহিনীকে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে মহাপুরুষ প্রসঙ্গ ধরণের রচনা সত্যেন্দ্রনাথের হাতেই বোধহয় এমন বিস্তৃত আয়তনের পূর্ণতা লাভ করলো। জীবনী ইতিপূর্বেই রচিত হয়েছে অনেক কিন্তু পূর্ণাঙ্গ জীবনী নয়, ছোট ছোট দু একটি ঘটনা নিজের স্মৃতি মঞ্জুষা থেকে উদ্ধার করে, তারই মধ্য দিয়ে একটি চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের আভাস দেওয়ার পদ্ধতি সত্যেন্দ্রনাথের লেখাতেই প্রথম রূপ লাভ করলো।

সাধারণ মানুষের একটা আক্ষেপ থাকে দেশের প্রধান প্রধান লোকদের কথা তারা দূর থেকেই শোনে, কাছে থেকে তাদের স্পর্শ পায় না; তাঁদের জীবনের জ্যোতি তাঁদের লেখায় তাঁদের কথায় সমস্ত দেশের জীবনকে আলো দেয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয়ের যে আনন্দটুকু তার কিছুটা না পাওয়ার দুঃখ কিছু কিছু লোকের থাকে বৈকি। আর যাঁরা সেই সৌভাগ্য পান, যুগান্তরকারী পুরুষদের সংস্পর্শে আসেন, তাঁদের শিখায় নিজেদের জীবন জ্বালিয়ে তোলেন তাঁদের সংখ্যা অল্পই। সত্যেন্দ্রনাথ সেই সৌভাগ্যবানদের অন্যতম যিনি জীবনে বহু গুণী জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গলাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে তাঁর স্মৃতির মঞ্জুষা থেকে কয়েকটি ছবি তুলে ধরে তিনি দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। অল্পবয়সের মনে থাকা ঘটনাগুলির মধ্যে আরও অন্যান্য ঘটনার মতো মহাপুরুষ প্রসঙ্গও একটা বিশেষ স্মরণীয় প্রসঙ্গ।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রগতিপন্থী লোক। আশ্চর্য উদার মন ছিল তাঁর। স্ত্রী-স্বাধীনতার তিনি ছিলেন পক্ষপাতী। অন্তঃপুরে কয়েদ-খানার মতো নবাবী বন্দোবস্তে মেয়েদের আটকে রাখা তাঁর কিছুতেই মনঃপূত হতোনা। শুধু স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হয়েই সত্যেন্দ্রনাথ থেমে যান নি। নিজের স্ত্রীকে নিয়েই স্ত্রী-স্বাধীনতার দ্বারখোলার কাজে অগ্রণী হলেন। তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তিনি গভর্ণমেণ্ট হাউসেও গিয়েছিলেন---আত্মীয়-স্বজনের বিরাগভাজন হওয়া সত্ত্বেও পিছিয়ে যাননি।

"ভারতী" পত্রিকায় দুবছর ধরে 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' প্রকাশিত হয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর অনুরোধেই মাসিক-পত্রের উপযোগী করে লেখা হয়েছিল সমস্ত রচনাটি। বোধহয় সেই

কারণেই প্রত্যেকটি সংখ্যায় বিচ্ছিন্নভাবে নানালোকের কথা লিখে লেখক তাঁর লেখাকে একটি সংখ্যাগত পূর্ণতা দিতে চেয়েছেন। তাই প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ পরিষ্কারভাবে ভাগ করে একটি বিশেষ ব্যক্তি বা একটি বিশেষ ঘটনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ কিছুই বলেন নি। দেবেন্দ্রনাথের আলোচনায় একেবারেই প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন এবং অপ্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করে পাঠকের ঔৎসুক্যকে নিরাশ করেছেন। সমস্ত রচনাটাই নিছক গল্পবলার ভঙ্গীতে লেখা। বিশেষ কোন গুরু দায়িত্বের তাগিদ মনে মনেও ছিল না, তাই এত সহজে অবান্তর প্রসঙ্গে চলে যেতে পেরেছেন। ছোটকাকা নগেন্দ্রনাথ আর মেজকাকা গিরীন্দ্রনাথের চিত্রগুলি সুন্দর হয়েছে। অমিতব্যয়ী নগেন্দ্রনাথ আর বিলাসী গিরীন্দ্রনাথের মধ্যে সে কালের বাংলা সম্বন্ধে জানবার কথাও কিছু কিছু আছে। সার্থক আলোচনা হয়েছে দ্বিজেন্দ্রনাথের। দ্বিজেন্দ্রনাথের বিচিত্র-সৃষ্টিপ্রতিভার উল্লেখ করে সেই আপনভোলা মানুষটির যে ছবি এঁকেছেন তা অপূর্ব। "বড়দাদার একটি ভৃত্য ছিল তার নাম কালী। তার উপর কত রাগ, কত তম্বী, কত ঝড়তুফান গালি বর্ষণ হচ্চে, আমরা দেখেছি অনেক সময়ে অকারণে; চসমা খুঁজে পাচ্চেন না, তাকে কত ধমকান হচ্চে, চীৎকার ধ্বনিতে আকাশ ফেটে যাচ্চে অথচ সেই চসমা হয়তো নিজের পকেটে, পকেটে বলাটাও ঠিক নয়, তাঁর চোখের উপর কপালে ঠ্যাকানো রয়েছে—আমরা দেখিয়ে দিলে শেষে হেসে অস্থির।...হয়তো কাউকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন সে যথাসময়ে এসে উপস্থিত, কিন্তু বড়দাদার কিছুই মনে নেই—তাকে খাওয়ানো দূরে থাকুক তার সামনেই নিজের খাবার খেয়ে যাচ্ছেন অথচ তাকে তার ভাগ দেবার কোন কথাই নেই। সে বেচারা প্রতীক্ষা

করে আছে কখন তার জন্য খাবার আসে—এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে—শেষে বড়দাদার ভুল ভেঙ্গে গেলে হাঁকাহাকি ডাকাডাকি পড়ে গেল।" এমনি করে এক একটি চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে তাঁদের সৃষ্টিক্ষমতার প্রতিও উল্লেখ করে গেছেন সত্যেন্দ্রনাথ। ব্যক্তিটিকে জানার আগ্রহও মেটে আবার তত্ত্বানুসন্ধানী মনও খুশী হয়।

লেখক ভূমিকায় বলেছেন যে তাঁর রচনায় সাধু ও চলিত ভাষার সহজ মিশ্রণ ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে—"কোন কোন পণ্ডিত সাহিত্য ক্ষেত্রে কথিত ভাষার ব্যবহার নানা কারণে দুষ্য বিবেচনা করেন, আবার 'বীরবল' প্রমুখ অপর একদল সাহিত্যিক আছেন যাঁহারা ঐ ভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী। আমি প্রয়োজন মত এই দুই প্রকার ভাষার উপযোগ করিয়া উভয় পক্ষেরই মনোরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াছি।" সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় একটা ঘরোয়া সাবলীলতা আছে; আশ্চর্য স্বচ্ছন্দ গতি তাঁর গদ্যের। অকারণ উচ্ছ্বাস নেই অথচ গদ্যের কঠিনতাও নেই, বিশুদ্ধ হাস্যরসের একটা মনখোলা আবহাওয়া গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। তারই মধ্যে প্রয়োজনবোধে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপেরও অভাব নেই। যেমন 'দেবেন্দ্র-সভা' প্রসঙ্গে বলছেন "এক সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজে যাঁরা ঘনঘন যাওয়া আসা করতেন তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন সম্ভ্রান্ত স্বর্ণবণিকশ্রেণীর লোক। এখন আর সে দলের লোক দেখতে পাই না—এমন হতে পারে যে, এক্ষণে কাঞ্চন দেবতার আরাধনায় মগ্ন থেকে তাঁরা আর উচ্চতর সাধনার সময় পান না।" অক্ষয় দত্তকে সাহিত্যগুরু বলে মানলেও কোথাও অক্ষয় দত্তর অনুস্মৃতি নেই। বোম্বাই প্রবাসের প্রথমেই সহজ চলতি ভাষার একটা নিদর্শন রয়েছে যাতে মনে হয় বীরবলীয় গদ্যের বিলক্ষণ প্রভাব তাঁর উপরে পড়েছিল। যেমন "নগরের মধ্যে কত উৎকৃষ্ট ফলের বাগান, আমরা আঙ্গুর ও

আঞ্জীর পেড়ে খেতুম—সে যে কি মিষ্টি লাগতো কি আর বলবো! পরিবারের একটি বালিকা আমার এমন ন্যাওটো হয়েছিল যে, সে কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চায় না—তাকে আমি দু'একটা বাংলা গান শিখিয়েছিলুম—শেষে কত চোখের জল ফেলে আমার কাছ থেকে বিদায় নিলে।"

'বোম্বাই প্রবাস' অংশকে কোন মতেই আর আত্মকথা বা আত্মজীবনীর পর্যায়ে ফেলা যায় না। ইতিহাস, দর্শন, শিল্প শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। বোম্বাইয়ের সমগ্র জীবন-যাত্রা তার অধিবাসীদের সম্পর্কে জানবার মতো বহু ঐতিহাসিক তথ্য এবং দার্শনিক আলোচনা তাঁর লেখায় রয়েছে। সুরুচিসম্পন্ন সৌন্দর্যবোধের অধিকারী ছিলেন তিনি। সুদীর্ঘ কালের বোম্বাই প্রবাসে যা যা দেখেছেন তার সৌন্দর্যের মূল্যও যাচাই করেছেন। সরকারী উচ্চপদ আরও বহুলোকেই পেয়েছে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মত সংগ্রহণশীল সত্যানুসন্ধানী মন নিয়ে সমস্ত জীবন এমন উদার দৃষ্টিতে দেখা এবং তাকে সাহিত্যবস্তু করে তোলার উদাহরণ খুব বেশী নেই।

রবীন্দ্রনাথ

সুদীর্ঘ ষাটবছর ধরে বাংলাসাহিত্যকে নানা আশীর্বাদে ধন্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সে দানের কোন হিসেব নেই। জীবনের নানা দিকে তাঁর দান অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়েছে। শুধু যে নূতনতর প্রকাশ-ভঙ্গীর সৃষ্টি তাই নয়, মানব চিত্তকেও নূতনতর সমৃদ্ধির দানে পুষ্ট করেছেন তিনি। যে বিরাট মন সমগ্র ভারতবর্ষকে সুদীর্ঘকালের সাধনায় নানা বৈভব বিলিয়ে গেল, তার পরিণতির যে ইতিহাস লোকচক্ষুর অগোচরে তাকে জানবার বাসনা সকলেরই আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বহির্জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল তার সম্বন্ধে দেশের লোকের ঔৎসুক্য খুব বেশি নয়। তাঁর যে সাধনা তাঁকে মহর্ষি করে তুলেছিল সেই সাধনার কথা দেশ আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবেন্দ্রনাথের মত নয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে তিনি চিরদিন গোপন করে রাখতে পারেন নি। নানা ঘটনার জটিলতা তাঁকে বার-বার আকর্ষণ করেছে: বহু রাজনৈতিক দুর্যোগে তাঁকে নীরবতা ভঙ্গ করে কথা বলতে হয়েছে; দেশ-বিদেশে নানা সমালোচনার আঘাত সহ্য করতে হয়েছে।

তাঁর ভিতরের জীবনে যেমন নানা বর্ণের নানা ধরণের তরঙ্গের ওঠাপড়া চলেছে বাইরের জীবনেও তার চেয়ে কম তরঙ্গ ওঠেনি। জীবিতাবস্থায় যে খ্যাতি তিনি পেয়েছেন তা অতি অল্প সাহিত্যসেবকের ভাগ্যেই ঘটে। তাঁর ঘরের জীবন আর বাইরের জীবন উভয়ই সমান আগ্রহে জানবার ইচ্ছা আমাদের সকলের।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনে যে কথাটি সত্য হয়ে ফুটে উঠেছিল তা ঠাকুর-পরিবারের আর সকল স্রষ্টার জীবনেই সত্য হয়েছিল। গায়ত্রীমন্ত্র তাঁরা বংশপরম্পরায় শুধু আবৃত্তিই করেননি, সে মন্ত্রকে জীবনের মন্ত্র করে তুলেছিলেন। উচ্ছল অনাবিল প্রাণের স্রোত তাঁদের হৃদয়ে শক্তি দিয়েছে সকল নূতনকে গ্রহণ করার। চোখ মেলে পৃথিবীকে তাঁরা দেখেছেন, তাই তাঁদের রসসাধনা কোন বিকৃতির চোরাগলিতে পথভ্রান্ত হয়ে যায় নি।

বার বার রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে বাড়ীর আবহাওয়াই তাঁকে সকল প্রাচীন অনুশাসনের উদ্যত তর্জনীর সম্বন্ধে নির্ভয় করেছে। শুধু তাই নয়, দাদাদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন, কোন ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে বাধা পাননি কোথাও। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী সেদিন নানা গুণীর মিলনস্থল হয়েছে। এমনি অবস্থায় শিশু রবীন্দ্রনাথ তাঁর চেতনা জাগ্রত করার অবকাশ পেলেন। প্রকৃতি তাঁকে নানা-ভাবে আকর্ষণ করেছে, পিতা তাঁর শিশুচিত্তটিকে উপনিষদের উদার জীবনবন্দনার সুরে বেঁধে দিয়েছেন, দাদারা দিয়েছেন অবাধ স্বাধীনতা। সেই শিশুকাল থেকে কাব্য রচনার প্রথম যুগ পর্যন্ত নানা বিচিত্র ছবি আর সুরে "জীবনস্মৃতি"র পাতা ভরা। অতি ছেলেবেলার স্বল্প কথা সাহিত্য হয়ে উঠেছে "ছেলেবেলায়"। আর নিজের কবি জীবনের মূল রহস্যটিকে উদ্ঘাটিত করেছেন "আত্মপরিচয়ে"। জীবনে যা কিছু লিখেছেন এক অর্থে সবই তাঁর আত্মজীবনী। কিন্তু এই সব লেখা মিলিয়েও বোধ হয় তাঁর পরিচয় শেষ হয় না। সমস্ত বিংশ শতাব্দীর চিন্তাস্রোতের উপর দিয়ে তিনি চলে যান বিরাট তরঙ্গের মতো, মানব-জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টির প্রসাদ পড়ে কিছু কিছু। সে তরঙ্গ এত বিরাট, সে মন এত বিশাল যে মনে হয় এর শেষ পরিচয় কোন-

দিনই কেউ পাবে না। অবশ্য একথা শুধু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কেন, সব মহৎস্রষ্টার সম্বন্ধেই ঐ একই কথা। সব জানানো বললেই সব কথা বলা যায় না। জীবনের রহস্য এত গভীর এত নিবিড় যে কোন ব্যাখ্যাতেই এর ইশেষ নে। এত হাসিকান্না, সুখদুঃখের উপর যে জীবন গড়ে ওঠে কতটুকুই বা লেখক পরিবেশন করতে পারেন তার।

আত্মজীবনী রচনায় রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল বরাবর। নিজের জীবনী নিজে রচনা করতে তাঁর দ্বিধা কম ছিল না। নিজের ভিতরে যে স্রষ্টা সৃষ্টির মুহূর্তে তাঁকে প্রেরণা যোগান তাঁর কৃতিত্বের ফসল বাইরের সংসারের সাধারণ মানুষটা দাবী করে বসতে পারে এ ভয় সব সময়েই ছিল। এই জন্যেই সাহিত্যপরিষদের অভিনন্দনের উত্তরে বলেছেন "অহংটাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো চোর। সে স্বয়ং ভগবানের সামগ্রীও নিজের বলিয়া দাবী করিতে কুণ্ঠিত নয়। আপনারা আমাকে যে সম্মান দিলেন তাহাকে আমার অহংকারের উপকরণরূপে ব্যবহার করিয়া অপমানিত করিব না।" কবির ব্যক্তিত্বে যে অহং আছে সে পাছে কবির গৌরবে ভাগ বসায় এ ভয় তাঁর ছিল। তাই জীবনস্মৃতি লিখতে গিয়ে বলেছেন পথিক যখন পিছন ফিরে পান্থশালার দিকে তাকায় তখন সেটাকে ছবি হিসাবেই দেখে। এই পান্থশালাতেই যে তার কিছু সময় কেটেছে সেই কথাটা সে ভোলে। নিজের জীবনের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনকে বিচার করা সহজ কথা নয়। নিজেকে ভুলতে হবে, পিছনে ফেলে আসা অতীতটাকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে হবে। সেই দেখার ব্যবহারিক মূল্য নিশ্চয়ই খুব বেশী হবে না, কারণ যেটা আপাত দৃষ্টিতে মূল্যবান মনে হবে সেটা বাদ পড়ে যেতে পারে আর যেটা সামান্য সেটা অসামান্য হয়ে উঠতে পারে।

'জীবনস্মৃতি'তে এবং 'আত্মপরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তাঁর সমগ্র জীবন ও সৃষ্টি কোন এক অজ্ঞাত রসস্রষ্টার স্পর্শে ও ইঙ্গিতে ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে, ক্ষুদ্রতর পরিধি থেকে বৃহত্তর পরিধির দিকে এগিয়ে চলেছে। তিনিই তাঁর জীবনে সকল সৃষ্টির মূল রহস্য। যত লেখা লেখেন তার সবগুলিকে এক পরিপূর্ণ ভাবধারার অঙ্গ করে তোলেন তিনিই। চেতন মনের সকল বাসনা উত্তীর্ণ হয়ে সেই রসস্রষ্টার সৃষ্টি তাঁরই লেখনীর মধ্য দিয়ে রূপ পায়। 'জীবনস্মৃতি'তেও বলেছেন "জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।" সেই চিত্রকর জীবনকে শুধু বাইরের ঘটনার প্রতিবিম্ব করেই রাখেননি, নিজের ভাণ্ডার থেকে বহু রঙ তাতে ঢেলেছেন। সেই চিত্রকরের অভিপ্রায়ের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের অভিপ্রায় কখনো মিলবে না। 'আত্মপরিচয়ে' আবার বলেছেন "আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে, আমার তাহা নাই।" 'জীবনস্মৃতি', 'আত্মপরিচয়', 'ছেলেবেলা' পড়ার পর পাঠক এই কথাকে স্বীকার করে নেবেন কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যাবে যথেষ্ট।

কিন্তু আসল কথা হলো নিজের দৈনন্দিন জীবনের তালিকা রচনার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের ছিলনা। তাই জীবনবৃত্তান্ত থেকে বৃত্তান্তটা বাদ দিয়ে কাব্যের মধ্যে দিয়ে জীবনের যে প্রকাশ তাকেই আত্মপরিচয়ে ফুটিয়েছেন। বাল্য ও কৈশোর জীবনের সব কথা জীবনস্মৃতিতে নেই। বাছাই করে যে ঘটনাগুলি দিয়েছেন সেগুলোর চিত্রমূল্য আছে, যে রবীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তী জীবনে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর জীবনের ভূমিকা হিসাবে এই সব ঘটনাগুলির চেয়ে প্রয়োজনীয় ঘটনা হয়তো ছিল। আত্মজীবনী যে জীবনবৃত্তান্ত নয়, তা যে একটি হৃদয় ও মনের বিকাশ ও উপলব্ধির ইতিহাস এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথ সহজে বুঝেছিলেন বোধহয়

চোখের সামনে মহর্ষির আত্মজীবনী ছিল বলেই। মহর্ষির আত্মজীবনীর মত এত নিবিড়ভাবে আত্মকেন্দ্রিক রচনা বোধহয় ইউরোপীয় সাহিত্যেও নেই। মনে করা অসঙ্গত নয় যে দেবেন্দ্রনাথের পদ্ধতি তাঁর অবচেতন মনের উপর গভীরভাবে কাজ করেছিল বলেই তাঁর 'আত্মপরিচয়' ও 'জীবনস্মৃতি' মহর্ষির 'আত্মচরিতে'র সমগোত্রীয়।

অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর জীবনস্মৃতি-সমালোচনায় বলেছেন যে শিশু-কাব্যে শৈশব জীবনের যে সমস্ত স্মৃতি কাব্য হয়ে উঠেছে সেই সব স্মৃতিই চিত্র হয়ে ফুটেছে 'জীবনস্মৃতি'তে। শিশুকালে মনের ভিতরে ধ্বনি মাধুর্যের একটা সাড়া জাগতো। অর্থ বোধগম্য হোক বা না হোক, শিশুমন তাতে বিচলিত হতো না, কিন্তু নানা অবস্থায় দেখি শব্দসম্ভারের ছটায় মনের মতো একটা অর্থ খাড়া করে নিয়ে একটা অদ্ভুত আনন্দ পেয়ে মন তৃপ্ত হতো। কবি-চৈতন্যের প্রথম স্পন্দন অর্থের চারুত্বে জেগে ওঠেনি, জেগেছে ছন্দের ধ্বনিতে, কবিতাব মিলে। এমনি করে যেদিন শুনলেন "জল পড়ে পাতা নড়ে" সেদিন "আমাব সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।" খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুয্যে একটি ছড়া বলতেন অত্যন্ত দ্রুতবেগে, সে ছড়ায় গল্পাংশটা বাদ দিয়েও সে ছড়াটা যে বহুকাল পর্যন্ত মনে রয়ে গেল তার কারণ "দ্রুত উচ্চাবিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা।" আকাশে যখন সূর্যের প্রখর দীপ্তি, মধ্যাহ্ন অবসন্ন তখন দূর থেকে ভেসে আসে চিলের ডাক আর সেই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে "বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারি সুর করিয়া 'চাই, চুড়ি চাই, খেলোনা চাই", হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিযা দিত।" গায়ত্রী মন্ত্রটা আবৃত্তি করতে থাকেন—সবটা যে বুঝতে পারতেন তা নয়, কিন্তু ঐ যে 'ভূর্ভুবঃস্বঃ'—ঐ অংশটিকে অবলম্বন করে মনটাকে খুব প্রসারিত করার

চেষ্টা করতেন। পিতার সঙ্গে বোটে গঙ্গায় বেড়াতে বেড়াতে পেলেন একটা 'গীতগোবিন্দ'। জয়দেবের বক্তব্য বোঝা হয়নি কিছুই, কিন্তু মনের ভিতরে ছন্দলালিত্যের একটা আবেদন পৌঁছাল—"নিভৃতনিকুঞ্জ-গৃহং এই একটি মাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল," জয়দেব সম্পূর্ণ তো নয়ই, অসম্পূর্ণ বোঝাও হয়নি, তবু মন ভরে যায় আনন্দে। ভাবনা-বিলাসী শিশুর কানে জগতের বিচিত্র ধ্বনি যে সুরলোকের সৃষ্টি করেছিল এই অতি গোপন তত্ত্বটি কবি না জানালে এমন করে তাঁর সুরসাধনার ভিতরের রহস্যটিকে তো জানা যেত না। বিশ্বের নানা সুর মনের ভিতরে নানা সৃষ্টির প্রেরণা যোগালো। সংসারের যেটুকু সীমায় বাঁধা, যেটুকু কাছের জিনিষ, যেটুকুর একটা স্পষ্ট অর্থ আছে তাকে নিয়েই তাঁর দিন কাটেনি। তার বাইরে আরও দূরে যাবার জন্য একটা ব্যাকুল আগ্রহ তাঁর সব সময়েই ছিল। যে শিশু দ্বিপ্রহরের স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে 'চুড়ি চাই, খেলোনা চাই' ধ্বনি শুনে উদাস হয়ে যেতো তারই জীবনের সার্থক পরিণতি দেখি 'ওগো সুদূর বিপুল সুদূর' এই আহ্বানে।

'জীবনস্মৃতি'র লেখক জীবনরহস্যের অনুসন্ধান করেছেন প্রকৃতির খাসমহলে। ভৃত্যতন্ত্রের গণ্ডীবাঁধা জীবনে ঘরের ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা-ভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে দেখেছেন বাইরের প্রকৃতিকে। জানলার খড়খড়ি দিয়ে বাইরে যে পুকুরঘাটটা দেখেছেন সেও ছবির মতন। তারই পারে দাঁড়িয়ে থাকে প্রাচীন বট, বিধাতার নিয়মের বিধানকে ফাঁকি দিয়ে স্বপ্নযুগের অসম্ভবের মতো। ঐ গণ্ডীবদ্ধতাই বোধহয় শাপে বর হলো, তাই এমন করে অতিবাস্তব পুকুরঘাট ধাপে ধাপে মনের মধ্যে স্বপ্নলোকের সঞ্চয় হয়ে রইলো। এক-একদিন মধ্যাহ্নে বাড়ীর ছাদের উপর থেকে সুদূর প্রসারী দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকতেন, চোখে পড়তো বাড়ীর বাগান প্রান্তের নারকেলশ্রেণী, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যেতো একটা পুকুর আর

তারা গয়লানীর গোয়ালঘর, পূর্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে সংকেতময় চিলে কোঠা। বাড়ির ভিতরের বাগানে গোল বাঁধানো চাতালের ফাটলের রেখায় রেখায় ঘাস ও গুল্মের জবরদখল অস্তিত্ব ঘোষণা মুগ্ধ হয়ে দেখেছেন। শরৎকালের সকালে ঘুমভাঙার সঙ্গে সঙ্গে এই বাগান তাঁকে আকর্ষণ করতো। "একটি শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি লইয়া আমাদের পূর্বদিকের প্রাচীরের উপর নারিকেলপাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।" সেই ছেলেবেলার দিনগুলিতে দৃষ্টি আর শ্রুতি কেমন করে সংসারের নানা বিচিত্র রহস্যের সামনে মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিতো সেই কথাই বার বার বলেছেন। আমাদের দেশে যে বয়সে শিশুদের উপর জবরদস্তি অত্যাচার চলে সেই বয়সে রূপধ্বনি-বিচিত্র এই সংসারের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হবার অবকাশ হয়েছে তাঁর। তখনকার দিনে নানা আকর্ষণে মন ছুটেছে। মাটি, জল, গাছপালা, আকাশ সবই নিবিড়ভাবে কথা বলে সেই শিশুর সঙ্গে।

অল্পবয়সে মানুষের বিশ্বাস করার শক্তিটা প্রবল থাকে। কোন কিছুকে অবাস্তব বলে বাতিল করে দেওয়া শিশুচিত্তের ধর্ম নয়। নানা উদ্ভট জটিল চিন্তা মাথায় এসে ঢোকে আর তার যে সমস্ত সহজ সমাধান সম্ভব সেই সমাধানগুলো কেন গৃহীত হয়না বয়স্কদের কাছে এই প্রশ্ন মনটাকে পীড়িত করে তোলে। শীতের দিনে শীতবস্ত্র না পাওয়ায় দুঃখ ছিল না, কিন্তু নেয়ামৎ খলিফা অবহেলা করে জামায় পকেট-যোজনা করতো না ঐটেই দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। আতার বিচি থেকে যে গাছ হয় এটা পরিণত বয়সে আর বিস্ময়কর মনে হয়নি কিন্তু শৈশবে সেই বিস্ময়েই মন ভরে উঠতো। পড়বার ঘরে চুরি করা পাথর জড়ো করে পাহাড় তৈরী হলো কিন্তু সেই পাহাড় যেদিনই বড়দের দৃষ্টিতে

পড়লো তখনই বিলুপ্ত হলো। "আমাদের লীলার সঙ্গে বড়দের ইচ্ছার যে এত প্রভেদ তাহা স্মরণ করিয়া গৃহভিত্তির অপসারিত প্রস্তরভার আমার মনের মধ্যে আসিয়া চাপিয়া বসিল।" মনে মনে ভাবতে বাধা ছিল না একটার পর একটা বাঁশ যদি ঠুকে ঠুকে পুঁতে দেওয়া যায় তবে হয়তো পৃথিবীর তলদেশের নাগাল পাওয়া যেতে পারে। মনে হয়েছে মাটি খোঁড়া হতে হতে রূপকথার রত্ন কিছু পাওয়া যেতে পারে। যারা বড়ো তারা তো সবই করতে পারেন, কেন করেন না এই ক্ষোভটা মনের ভিতরে সারা শিশুকাল ধরেই ঘুরেছে। সিঁড়ির উপর সিঁড়ি চাপিয়ে যতই ওপরে ওঠা যাক তবু ওই নীলাকাশে পৌঁছান যায় না। মনে বিস্ময়ের শেষ নেই। এমনি করে সেই শিশুমন কোনদিকে কোথাও বাধা না পেয়ে সুরে, রূপে, বিস্ময়ে ফুটে উঠেছে। শিশু-জীবনের এই রূপ এমনভাবে বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও দেখি না। ভবিষ্যতের পরিণতবুদ্ধির ভারে আচ্ছন্ন না করে সেই শিশুর মনের প্রকাশকে সেই অবস্থার সূক্ষ্ম অনুভূতির কল্পনাপ্রবণ সুরটির সঙ্গে বেঁধে রাখা কম কথা নয়।

বাল্যজীবনের আর একটি ঘটনা ভৃত্যরাজতন্ত্র। ভৃত্যদের শাসন শুধু তাঁর জীবনের ঘটনাই নয়, সমস্ত বাংলা সাহিত্যের রাজদরবারে ঐ পরিচ্ছেদ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করলো। সেই সঙ্গে সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর দুএকটি চাকরও বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে রইলো। এই ভৃত্যেরা শুধু ভৃত্যই নয়, মাঝে মাঝে গুরুমশায়ও হয়ে বসতো। এদের কাছে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনে অনেক সন্ধ্যা কেটেছে। সে সন্ধ্যাগুলো মনের স্মৃতিমঞ্জুষায় দুএকটা সঞ্চিত আছে। সে বর্ণনা মনে রাখবার মতো। অজিতকুমার বলেছেন "মানুষের জীবনের সকল প্রকারের স্মৃতির মধ্যে যে এমন অপূর্ব একটি চিত্ররস

থাকিতে পারে, এই গ্রন্থ না পড়িলে তাহা মনে করাই সম্ভব হইত না।" এই বক্তব্যের সত্যতা অনুভব করা কঠিন হবে না মোটেই, যদি এই ভৃত্যতন্ত্রের অধীনে কাটানো একটি সন্ধ্যার বর্ণনা পড়ি। ভৃত্য-গুরুমশায় সন্ধ্যায় রামায়ণ মহাভারত শোনান, "ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়িকাঠ পর্যন্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত, টিকটিকি দেওয়ালে পোকা ধরিয়া খাইত, চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো চক্রাকারে ঘুরিত, আমরা স্থির হইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম। যেদিন কুশলবের কথা আসিল, বীরবালকেরা তাহাদের বাপখুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার সেই অস্পষ্ট আলোকের সভা নিস্তব্ধ ঔৎসুক্যের নিবিড়তায় যে কিরূপ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা এখনো মনে পড়ে।" অবনীন্দ্রনাথের 'আপনকথা'য় এই গল্পশোনার মায়ামুগ্ধ সন্ধ্যার বর্ণনা আছে। দুই চিত্র দুই হাতের, তাদের তুলনা চলে না। রসিক পাঠকের কাছে এ চিত্র যে রসসিক্ত অনুভূতির সৃষ্টি করে তা কোন সমালোচনার অপেক্ষা রাখে না।

কত যে ছবি সাজিয়েছেন পর পর তার শেষ নেই। সেই পিছনে ফেলে আনা ছোটবেলা পরিণত বয়সে মনের মধ্যে একটি অদ্ভুত স্নেহরস সঞ্চিত করে। শিশুজীবনের চপল কার্যকলাপ একটা সমবেদনা-মাখা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন। শিশুর ভুলভ্রান্তি, তার ইচ্ছা অনিচ্ছার যে ওকালতি করেছেন তা নিজের ছেলেবেলার অসম্পূর্ণতার সাফাই নয়। তা সমস্ত কালের শিশুচিত্তের মুক্ত নির্ঝর প্রাণপ্রবাহের জয়গান। শিশু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই অজানা চিত্রকর পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথের বাল্য অবস্থা আঁকেননি, এঁকেছেন জগতের সমস্ত শিশুর লীলাচঞ্চলতাকে। তাই 'জীবনস্মৃতি' শুধু আত্মজীবনী নয়, আমাদের সকলেরই জীবনী। যখন বালক কালে ছাত্রসন্ধানী রবীন্দ্র-

নাথ বারান্দার বিশেষ কোণের রেলিংগুলিকে ছাত্র করে নেন, আর লাঠি হাতে সেই ছাত্রদের মধ্যে ভালমন্দ বিচার করেন তখন কি নিজেদের জীবনের অনুরূপ ঘটনা এই কথা মনে করায় না যে সকল শিশুর অন্তর্নিহিত শিশুত্বের সহজ ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ রূপ দিয়েছেন।

বিদ্যাশিক্ষার যে আয়োজন তাঁর জীবনে ঘটেছিলো তাতে অভিভাবকেরা যে কোথাও কার্পণ্য করেছিলেন এ কথা বলা চলে না। গান শেখা, যন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শেখা, অস্থিবিদ্যা শেখা, ড্রয়িং, জিমন্যাষ্টিক শেখা, মেঘনাদবধ, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বোপদেবের ব্যাকরণ পড়া সবই চলেছে একসঙ্গে। ষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা এর চেয়ে বেশী ভার চাপিয়েছিলেন পুত্রের উপরে, একথা মিল সাহেবের আত্মজীবনী থেকে পাওয়া যায়। মিল সাহেবও সেই সব শিক্ষা অকাতরে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। নানা বিষয়ের শিক্ষক রাখা হয়েছিল, শিক্ষককে কি করে ফাঁকি দেওয়া যায় সে বুদ্ধি না থাকলেও শিক্ষক না আসার জন্য আকুলতার অন্ত নেই। স্কুল-পলাতক বালককে বাড়ীর শিক্ষকরাও বেঁধে রাখতে পারেন নি। সেই রীতি-না-মানা পলাতক মন ডানা মেলে উধাও হয় কল্পনার রাজত্বে। সহায় ছিলেন বড়দাদা,—"যদি দৈবাৎ স্কুল ঘরের বারান্দা দিয়া যাইবার কালে আমাদের নিদ্রাকাতর অবস্থা দেখিতে পাইতেন, তবে তখনই ছুটি দিয়া দিতেন।"

কিন্তু জোড়াসাঁকোর বাড়ীর কড়ি বরগা দেয়ালের জঠর থেকে বেরুবার সুযোগ একদিন পাওয়া গেল। কলকাতায় ডেঙ্গুজ্বর তাঁর কাছে এলো নূতন আশীর্বাদ নিয়ে। যে প্রকৃতিকে এতদিন ঘরের ভিতর থেকে দেখেছেন তাকে বাইরে দেখার সুযোগ হলো। গঙ্গার তীরে

বসে বসে বালকের মন জোয়ারভাঁটার আসা-যাওয়া দেখে, নৌকার বিচিত্র গতিভঙ্গি দেখে, আর অবাক বিস্ময়ে দেখে সূর্যাস্ত আর সশব্দ বৃষ্টি ধারায় ঝাপসা হয়ে যাওয়া কালো দিগন্ত। যে পৃথিবীকে গতানুগতিক অভ্যাসের জড়তা দিয়ে দেখেছেন তাকে সব তুচ্ছতার আবরণ থেকে মুক্ত করে দেখলেন। কিন্তু সেই যে ভাললাগা শিশু দৃষ্টির সেই যে বিস্ময়বিমুগ্ধতা তা তাঁর পরবর্তী জীবনে রইলো না, কোন পরিণত লোকেরই থাকে না। তাই সেই বাড়ি, সেই বাগান, সেই ঘাট যা সেই প্রথম পরিচয়ের মুগ্ধতা নিয়ে দেখেছিলেন তা হারিয়ে গেছে, "কেন না বাগান তো গাছপালা দিয়ে তৈরী নয়, একটি বালকের নববিস্ময়ের আনন্দ দিয়ে সে গড়া, সেই নববিস্ময়টি এখন কোথায় পাওয়া যাইবে।"

তারপর আবার ফিরে এলেন সহরে। জীবনে একটা অদ্ভুত accident ঘটলো। ফলে পিতার আদেশ হলো বাংলা পড়ার আর প্রয়োজন নেই। খুসীতে নেচে উঠলো মন, পড়ার কঠিন থেকে মুক্তি পাওয়া চিরদিনই তাঁর কাছে আনন্দকর মনে হয়েছে। বাংলা মাষ্টারের ছুটি হয়ে গেল। পণ্ডিতমশাই থেকে আরম্ভ করে বোর্ড টাঙ্গানোর পেরেকটা পর্যন্ত মরীচিকার মতো শূন্য মনে হলো। কিন্তু এই শূন্যতার আনন্দ সেই বালক কালের। তার ভিতরকার সত্যটুকু পরিণত বয়সে বোঝা গেল। বাংলা ভাষা শিখতে সুরু করেছিলেন মেঘনাদবধ পড়ে। "যে জিনিষটা পড়িলে উপাদেয় সেইটাই মাথায় পড়িলে গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে।" কাব্যরস আস্বাদন না করে মেঘনাদবধ থেকে বাংলা শিখতে গিয়ে সেই অবস্থা হলো। কিন্তু পরিণত বয়সে বুঝলেন ছেলেবেলায় বাংলা পড়েছিলেন বলেই শিক্ষা জিনিষটা জীবনে পূর্ণ হয়েছিল। স্কুলের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ভাল নয়। বোধহয়

সেই কারণেই সেই ভাল না লাগা দিনগুলোর ছবি অকারণে বাড়িয়ে যাননি।

কিন্তু কোথাও কোন ক্ষোভ নেই। শৈশবের দিনগুলিতে যে সব কাজ করেছেন তার জন্য মনে কোন ধিক্কার নেই। অজিতকুমার ঠিকই বলেছেন "বুড়াবয়সে কবি নিজে যে সেই বাল্যের স্মৃতিগুলি আঁকিতেছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার নিজের কি একটি নিগূঢ় উপভোগ নাই?" বড়ঘরের ছেলেরা যে সুখসুবিধা পেয়ে থাকে তিনি তার কিছুমাত্র পাননি, তবু মনের ভিতরে সেই বিগত দিনগুলি যে মায়ার জগৎ সৃষ্টি করেছিল তার জন্য খেদোক্তি আছে পরিণত বয়সেও। স্কুলের পাঠ চুকলো, বাংলা শেখার পাঠ চুকলো সুরু হলো ঘরে পড়া। লুকিয়ে লুকিয়ে অপাঠ্য বই পড়ায় উৎসাহ ছিল কিন্তু ঘরের পড়াতেও সেই ফাঁকি দেওয়ার প্রবৃত্তি গেল না। বাংলায় ম্যাকবেথ পড়ান গৃহশিক্ষক, যতক্ষণ বাংলায় অর্থ তর্জমা করে না লেখেন ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়। সংস্কৃত অধ্যয়নের ফলাফলও এর চেয়ে ভাল নয়। অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শেখাতে না পেরে রামসর্বস্ব পণ্ডিত অর্থ করে শকুন্তলা পড়াতে লাগলেন। কিন্তু লুকিয়ে চুরি করে দীনবন্ধুর জামাই-বারিক পড়া শেষ হলো। আবার "বিদ্যাপতির দুর্বোধ্য বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই আমার মনোযোগ টানিত।" কোন ভাবেই রুটিন-মাফিকতা চললো না জীবনে। যেখানে যা দুর্বোধ্য অথচ পাঠ্য নয় তাকেই আকর্ষণ করে মন। চিরকালের খাপছাড়া কবির জীবনে এমনি করেই শিক্ষালাভ ঘটেছিল। বিলেতে গিয়েও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সেখানেও স্কুল কলেজের শিক্ষা এড়িয়ে বেড়িয়েছেন। আসল শিক্ষা যেটুকু ঘটেছিল তা মানুষের সংস্পর্শেই ঘটেছিল। জীবনের চারদিকে প্রাণের যে অফুরন্ত স্রোত তার থেকেই যা কিছু

শিক্ষা পাবার পেয়েছেন। ধরে বেঁধে গান শেখাতে চেয়েছিলেন যদুভট্ট, সে গান যেমন শেখা হয়নি তেমনি কোন শেখাই ধরে বেঁধে হয়নি।

যে সমস্ত লোকের প্রভাব পড়েছিল মনের উপর, তাঁদের ছবি এঁকেছেন। স্পর্শপ্রবণ মনের রসসংবেদনশীলতায় সে ছবি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর গাছপালা, নদনদী, সূর্যচন্দ্র যেমন করে মুগ্ধ করেছিল, যেমন করে চেতনার দ্বার খুলে দিয়েছিল তেমনি করে অনেক মানুষের দেখা পেয়েছিলেন যাঁদের প্রাণের স্পর্শে অনুভূতির জগৎ নবীনতর ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হলো। নিজেকে তিনি রোমান্টিক বলেছেন "রোমান্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্যের দিক, তাহা জীবন-সমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক, তাহা অবিরাম গতিচাঞ্চল্যের উপর আলোক-ছায়ার দ্বন্দ্ব সম্পাতের দিক। আর একটা দিক আছে যাহা বিস্তার, যাহা আকাশনীলিমার নির্ণিমেষতা, যাহা সুদূর দিগন্ত রেখায় অসীমতার নিস্তব্ধ আভাস।" রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় আছে 'জীবনস্মৃতি'তে, যে পরিচয় আছে 'ছেলেবেলা'য়, তা এই রোমান্টিক শিশুর পরিচয়। সে শিশু বইয়ের পাতা থেকে শিক্ষা নেয়নি; গ্রহণ করার নিয়ম-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে মন তার খুসী নয়, তাই আকাশের ঘনকালো মেঘপুঞ্জ দেখে মনে বিস্ময় জাগে, নানা লোকে নানা সঞ্চয় রেখে গেছে মনের মধ্যে। আত্মপরিচয়ে বলেছেন "বস্তু যা পেয়েছি তার চেয়ে রস পেয়েছি অনেক বেশী। আজ বুঝতে পারি এই জন্যেই আমার আসা। আমি সাধু নই, সাধক নই, বিশ্বরচনার অমৃত-স্বাদের আমি যাচনদার, বার বার বলতে এসেছি ভাল লাগলো আমার।" কোনদিনই বস্তুর দিকে নজর ছিল না। তাই রোমান্টিক মন বস্তু-অতীতকে খুঁজে ফিরেছে প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের মধ্যে। বাড়ীতে যে আবহাওয়া তৈরী হয়েছিল মহর্ষির বর্তমানে, সেই হাওয়াতে তাঁরা

মানুষ। নূতনকাল তখনো পুরোপুরি আসেনি, তখনও কেরোসিনের আলো জ্বলেনি; কিন্তু নূতন চিন্তার স্রোত বইতে সুরু করেছে। বহু সামাজিক সংস্কারের জড়তা কাটিয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ী তখন নানাদিক থেকে নূতন প্রাণে স্পন্দিত। সেই স্পন্দনের ধ্বনি তাঁর জীবনেও বেজেছে। নানা জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হয়েছে সেদিন সেই বাড়ীতে। তাঁরা মনের বীণায় নানা সুর বেঁধেছিলেন যার প্রভাবে কবির সারাজীবনের সুরসাধনা এমন বিচিত্র হয়ে উঠলো।

শিশুকালের বাধানিষেধ ঘুচিয়ে মুক্তি দিলেন জ্যোতিদাদা। এতকালের শাসনপীড়নে যেটুকু শিখেছিলেন সব ভুলে নিজেকে নূতন করে আবিষ্কারের সুযোগ পেলেন। সমস্ত ভালমন্দের মধ্যে আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। শিশুচিত্তকে এমন করে কেউ মুক্তি দেয়নি। তাঁর দাদাদের কথা না বলা হলে কোন রবীন্দ্রজীবনী যে পূর্ণ নয় তা তাঁর আত্মজীবনীতে দাদাদের আলোচনা থেকেই বোঝা যায়। নিয়ম-মাফিক লেখাপড়ার প্রথম বাধন আল্গা করলেন সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ বাংলাকেই মুখ্য পাঠ্যবস্তু করে তুলে, বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ তন্দ্রালস দেখলেই ছুটি মঞ্জুর করতেন, আর সব বাঁধন থেকে ছুটি দিলেন জ্যোতিদাদা। এদিকে বাড়ীতে তখন সাহিত্যের হাওয়া বইছে। দাদা গণেন্দ্রনাথ রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়ে নবনাটক লিখিয়ে অভিনয় করাচ্ছেন, দেশবিদেশের ইতিহাস চর্চায় তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ; আর ছিলেন গুণদাদা—বালক রবীন্দ্রনাথের কবিতার একজন উৎসাহী পাঠক। সৃষ্টির জোয়ার বইছে বাড়ীতে, বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ তখন লিখছেন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' - তাঁর ফেলে দেওয়া কবিতার টুকরো লেখা সারাবাড়ীতে ভেসে বেড়াচ্ছে। আরও শিশুকালে কাব্যচর্চায় উৎসাহিত করার আর এক শ্রোতা পেয়েছিলেন—শ্রীকণ্ঠবাবু। যে কটি চরিত্র এই চিত্রশালায়

জড়ো হয়েছে তাদের মধ্যে সকলেরই প্রাণশক্তির প্রাচুর্য আছে ; নানা বিচিত্রক্ষেত্রে সেই প্রাণশক্তির প্রকাশ দেখি তাঁদের। এই চিত্রগুলি শ্রীকণ্ঠবাবু, অক্ষয় চৌধুরী ও দেবেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। এ ছাড়াও আছে লোকেন পালিত, প্রিয়বাবু, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথা, সেগুলি চিত্র নয়, তা ব্যক্তিত্বের গুণগ্রাহী সমালোচনা। জীবনস্মৃতির পাতায় শ্রীকণ্ঠবাবুর আয়ু আড়াই পাতা। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে কত নায়ক-নায়িকার ঘটনা-জটিল চরিত্রকে ম্লান করে ঐ আড়াই পাতার শ্রীকণ্ঠবাবু অক্ষয় হয়ে আছেন। সহজ প্রাণখোলা হৃদ্যতার প্রতিমূর্তি ছিলেন শ্রীকণ্ঠবাবু। যা কিছু দেখতেন সবই ভাল লাগতো তাঁর, তাই কবির অল্প বয়সের সব কবিতাই এত সহজে ভাল বলতে পারতেন। তিনি ছিলেন সকলের সমবয়সী। আবেগে উন্মত্ত হয়ে উঠতেন গান গাইতে গাইতে। শ্রীকণ্ঠবাবু আর দেবেন্দ্রনাথ এই দুই চিত্র সম্বন্ধে অজিতকুমার লিখেছেন—"এই চিত্র দুইটি কবির জীবনের ভাবের এবং কল্পনার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে বলিলেও অসংগত হয়না। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভিতরকার যোগ আছে সেইজন্য ইহারা কল্পনাকে কেবলমাত্র স্পর্শ করিয়া বিদায় লয় নাই, খুব গভীর ভাবে আঘাত করিয়াছে। সমুদ্রের উপরিভাগের সঙ্গে সমুদ্রের তলদেশের সম্বন্ধের মতো এই দুইটির পরস্পরের সম্বন্ধ। একটি চঞ্চল, অপরটি স্তব্ধ ; একটি আত্মবিহ্বল, অপরটি আত্মসমাহিত, একটি লীলাময়, অপরটি যোগমগ্ন, একটি সজন অপরটি নির্জন। পূর্ণতার এই দুইটি দিকই কবির কাছে তুল্য আদরণীয়।" এই দুটি চরিত্র তাঁর জীবনের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু 'জীবনস্মৃতি'তে সে আলোচনা করেননি। করেননি বলেই তার চিত্রধর্ম রক্ষিত হয়েছে। সারাজীবনের অভিজ্ঞতার বোঝা চাপিয়ে সে চিত্র কোথাও ভারী করে তোলেন নি।

আর কয়েকটি চরিত্রের ছবি আছে যাদের এই প্রসঙ্গে স্মরণ না করা অন্যায় হবে। স্বাদেশিকতার নূতন স্রোত তখনো আসেনি দেশে। বাইরের উচ্ছ্বাসের উন্মত্ত স্রোতে স্বাদেশিকতা ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণে ঢোকেনি। স্বাদেশিকতা তাঁদের অন্তরের সামগ্রী ছিল। যা ছিল অন্তরের সামগ্রী, তার বহিঃপ্রকাশের উচ্ছ্বাস দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার বিচার করেননি। কয়েকটি চরিত্রের ছবি দিয়েছেন যাঁরা নানা দুঃসাহসিক পরীক্ষা আর গবেষণা করেছেন দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করার জন্য। দেশের ভাষা যখন শিক্ষিত সমাজে অবহেলিত তখন দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর পুত্রেরা দারুণ উৎসাহে মাতৃভাষার চর্চা করেছেন। সেটা খাপছাড়া দুর্ঘটনা নয়, তার পিছনে সমস্ত পরিবারের দেশপ্রেম প্রেরণা যুগিয়েছে। যে কাজ প্রশংসা আনেনা, যে কাজে আপাতঃ করতালি মেলেনা সেই সব কাজ ঠাকুরবাড়ীর লোকেরা উৎসাহের সঙ্গে করেছেন বা সেই সব কাজে তাঁরাই হয়েছেন প্রধান উৎসাহদাতা। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিদাদা ও রাজনারায়ণবাবুর উল্লেখ করেছেন। যে স্বাদেশিকতার সভা রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে হতো তার ছিল ভয়ংকর গোপনীয়তা। রুদ্ধদ্বার অন্ধকার ঘরে ঋকমন্ত্রের দীক্ষা আজ ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই মনে হয়না। পরবর্তীকালের অগ্নিযুগের বাংলার কোন সভা-সমিতির সঙ্গে এই সভার সামান্যতম যোগও নেই। সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা যতই হাসির উদ্রেক করুক তাতে সততার অভাব ছিলনা কোথাও। সর্বভারতীয় জাতীয় পোষাকের কথা আজকের ভারতে কেউ কেউ চিন্তা করে বটে, কিন্তু অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে সর্বপ্রদেশ সমন্বয় করে ভারতবর্ষীয় পোষাক পরার চেষ্টা করেছিলেন জ্যোতিদাদা। বোমা নয়, পিস্তল নয়, জেলখানা নয়, অতিদূরদর্শী কিন্তু সহৃদয় প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "দেশের জন্য অকাতরে

প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোষাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।"

যত ঘটনা আর কথা জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন তার সঙ্গে নিজের ব্যাবহারিক জীবনের যোগ খুব অল্পই দেখিয়েছেন। গল্প বলার আনন্দেই অনেক গল্প বলেছেন। কিন্তু সবটা মিলিয়ে ধীরে ধীরে এই কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই পরিবেশে এই সব কল্পনাপ্রবণ স্রষ্টাদের সঙ্গ পেয়ে মনের ভিতরে সৃষ্টির কাজ সুরু হয়ে গেল। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের তৈরী হয়ে ওঠার ইতিহাস ছড়িয়ে আছে 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় পাতায়। নানা ধরণের ভাবুকতা মনের ভিতরে উচ্ছ্বাসের আবেগ ফেনিয়ে তোলে। সেই প্রাথমিক উচ্ছ্বাসে যে সব লেখা লিখেছিলেন সেগুলোর প্রতি মোহমুক্ত দৃষ্টিতে যে সমালোচনা করেছেন তা প্রায় নির্মম বলা চলে। বাংলা সাহিত্যের তখনও এমন অবস্থা হয়নি "যাহাতে সেই সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রচনাবিধি লেখকদিগকে শাসনে রাখিতে পারে।" ফলে যত উচ্ছ্বাস মনের ভিতর আবেগের ঝড় পুঞ্জীভূত করে তোলে তার থেকে কিছু না কিছু অসংযত জঞ্জালের সৃষ্টি করতে পারে। যা তিনি সৃষ্টি করেছেন আজকের সমালোচক সবটা জঞ্জাল বলে বাতিল করে দেবেন না নিশ্চয়ই। কিন্তু নিজের রচনার প্রতি তিনি কোন করুণাই দেখাননি। সে রচনা শুধু কাঁচা নয়—'উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতা' তাঁকে লজ্জা দেয়। তবু এ কথা কবি বুঝেছেন যে ঐ বয়সটাই ছিল ভুল করার বয়স। ভুল করার অধিকার সে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন বলেই সে সময়ের সৃষ্টি ব্যর্থ হলেও সময়টা ব্যর্থ হয়নি।

তারপর হঠাৎ একদিন সৃষ্টির জোয়ার এল ভিতর থেকে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'সন্ধ্যা সংগীত', 'প্রভাতসংগীত' নানা ছন্দে নানা স্রোতে এল।

বিরাটতর কবিজীবনের ভূমিকা রচনা হতে লাগলো। জগতের আনন্দ-রূপ সমস্ত দৃষ্টির সামনে মুহূর্তে ধরা পড়লো। তার পর 'প্রকৃতির পরিশোধ', 'ছবি ও গান', আর 'কড়ি ও কোমল'। আপনাকে প্রকাশ করার সময় এটা, কেবলি যৌবনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা উদার উন্মুক্ত পৃথিবীর দিকে হৃদয়কে টেনে নিয়ে যায়। নিজেকে বিরাটতর করে ব্যাপ্ত করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ঐ বয়সের ধর্ম। যখন পৃথিবীর প্রতি ধূলি-কণায় অপার আনন্দের বার্তা খুঁজে পেতে সুরু করেছেন তখনই শেষ করে দিলেন রচনা।

আলোচনার আরও অনেক কিছু বাকী রয়ে গেল। অনেক দেশ ঘোরা হয়েছে, আরও অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কিন্তু সমস্ত জীবনের শুধু সূত্রটুকু কবি ধরিয়ে দিয়েছেন। শুধু আরম্ভটুকু। তারপর কী হলো সে কথা জানতে হলে আর উপায় নেই। আত্ম-পরিচয়ের মধ্যে যে কবিকে পাওয়া যাবে, সে কবির ঠিকানা 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় নেই। 'জীবনস্মৃতি'র দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে বলেছেন "জীবনের সকল স্মৃতি স্তূপাকার করিয়া ধরিলে তাহার কোন শ্রী থাকেনা। সেই জন্যই আমি একটি সূত্র বাহিয়া স্মৃতিগুলিকে সাজাইতেছিলাম। সেই সূত্রটিই আমার জীবনের প্রধান সূত্র, অর্থাৎ তাহা আমার লেখক জীবনের ধারা।" লেখক জীবনের ধারাটিকে ফুটিয়ে তোলার, নিজের জীবনের অন্যান্য প্রকাশ থেকে নিজের কবিচেতনাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার এই চেষ্টার একটা বিশেষ কারণ থাকা সম্ভব। সে কারণ বোধ হয় এই যে নিজের কাব্যরচনার সুদীর্ঘ ধারাটিকে নিজের জীবনের পটভূমিকায় রেখে কবি বিচার করতে বা আলোচনা করতে ভালবাসেন। সেই জন্যই কবিচেতনার প্রকাশকে প্রধান আলোচ্য বস্তু করে বস্তু জীবনের পটভূমিকাকে সাজাতে হয়েছে।

'জীবনস্মৃতি'রই শিশু সংস্করণ 'ছেলেবেলা'। ছোট ছেলেদের মনের মত কিছু লেখবার অনুরোধে 'ছেলেবেলা'র সৃষ্টি। সেই শিশুকালের গল্পই ছেলেদের কাছে দেওয়া যায় যখন বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা না গেলেই সব জিনিষ অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেবার মত দুর্বুদ্ধি মানুষের হয় না। জীবনের অনেকটাই তখন কুয়াশায় ঢাকা। সেই কুয়াশাটাই তখন স্বাভাবিক। বাস্তবসত্যকে ঢেকে তা মনকে নানা দিগদিগন্তে ছোটায়। সেই নানা দিকে ছোটা মনের কথা সেই কালের ভাষায় গেঁথে রাখার ইচ্ছে ছিল। নিজেও মনে করেছেন যে ছোটদের মত করেই লিখেছেন, কিন্তু ভাবনাগুলো যে শৈশবের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে গেছে তাও নিজেই বুঝেছেন। তাই বলেছেন 'তখনকার কালের বর্ণনার ভাবাবদল করিনি, কিন্তু ভাবটা আপনিই শৈশবকে ছাড়িয়ে গেছে।" 'ছেলেবেলা' যত সহজ করেই লেখা হোক, তা ছেলেদের জন্য নয় মোটেই। 'জীবনস্মৃতি' আর 'ছেলেবেলা' একই কথার ভিন্নরূপ। লেখক-জীবনের সূত্রটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য যে গল্পের মালাযোজনা তা হলো 'জীবনস্মৃতি'; আর উদ্দেশ্যহীনভাবে সেই বিস্ময়বিমুগ্ধ প্রাণ-প্রাচুর্যভরা দিনগুলিকে নিয়ে জল্পনা করা হলো 'ছেলেবেলা'র কথা। কবি নিজে বলেছেন 'জীবনস্মৃতি' আর 'ছেলেবেলা'র তফাৎ "সরোবরের সঙ্গে ঝরণার তফাতের মতো। সে হল কাহিনী, এ হলো কাকলি।"

শিশু সাহিত্যের আসরে রবীন্দ্রনাথের অবদান অল্প নয়। শিশু-সাহিত্য অনেকদিন ধরে আমাদের দেশে কোন মর্যাদা পায় নি। শিশু-সাহিত্য বলেই নানা জনের অবহেলা ও তাচ্ছিল্য-জনিত সৃষ্টির জঞ্জালে বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণ ভরে উঠেছিল। শিশুদের জন্য লেখা বলেই সেখানে যে কল্পনার বিকৃতি চলে না রবীন্দ্রনাথ এ কথা বার বার বলেছেন। সহজ কথা সংসারে ইচ্ছে করলেই সহজে বলা যায় না।

তার জন্য মনের ভিতরে ছেলেমানুষীর খেয়ালখুসী সত্যি সত্যিই থাকা চাই। প্রাণের সেই অবারিত উচ্ছ্বাস না থাকলে পরিণত মনের কষ্ট-কল্পনায় শিশুসাহিত্য হয় না। 'ছেলেবেলা'র কিছু অংশ প্রথমে 'ছড়ার ছবি' নাম দিয়ে কবিতায় রচনা করা হয়েছিল। ছন্দের হাল্কা হাওয়ায় শিশুচিত্তের কল্পনাকে স্পর্শ করা যাবে এই জন্যই ছড়ার ছবি লেখা হয়েছিল। শব্দের ধ্বনি তাঁর নিজের কল্পনাকে কেমন করে জাগিয়ে তুলতো তা আমরা আলোচনা করেছি। অর্থ বোঝা না গেলেও 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' শব্দটুকুই মনের ভিতরে একটা ব্যাপ্তির ধারণা এনে দিতো। এই কথা কবি কখনো ভোলেন নি। তাই 'ছেলেবেলা'র ছবি অনেকটাই শব্দের রঙে আঁকা। সেই ছবি দু একটা এখানে তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

"সহরে শ্যাকরাগাড়ী ছুটছে তখন ছড়ছড় করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড় বের করা ঘোড়ার পিঠে।"

"বাঘের চোখ জ্বলজ্বল করছে, গা করছে ছমছম। সঙ্গে আছে বিশ্বনাথ শিকারী, বন্দুক ছুটলো দুম্। ব্যস সব চুপ। তার পর এক সময়ে পাল্কীর চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খী, ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ ছপ ছপ ছপ; ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে সামাল সামাল ঝড় উঠলো।"

"নিঝুম অন্ধকারের নাড়ীতে যেন তালে তালে বেজে উঠছে বেহারাগুলোর হাঁই-হুই হাঁই-হুই, গা করছে ছমছম্। ধুধূ করে মাঠ, বাতাস কাঁপে রোদ্দুরে। দূরে ঝিকমিক করে কালিদিঘির জল। চিকচিক করে বালি। ডাঙার উপর থেকে ঝুঁকে পড়েছে ফাটল-ধরা ঘাটের দিকে ডালপালা ছড়ানো পাঁকুড় গাছ।"

কবির হাতে ছবি ফুটে ওঠে। সৃষ্টি শুধু দক্ষতা নয় তার চেয়ে অনেক বেশী। 'ছেলেবেলা'য় সেই কথা প্রমাণ হলো। ছেলেমানুষের খেয়াল বালভাষিত গদ্যে কল্পনার তালে তালে নেচে ওঠে 'ছেলেবেলা'য়। কোন ব্যক্তির জীবনের কাহিনী শিশুদের কাছে তখনই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যখন খুব চমকপ্রদ ঘটনার অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটে সে জীবনে। তেমন ঘটনা রবীন্দ্রনাথের জীবনে অনেক ঘটেনি। কিন্তু শুধু বলবার গুণেই 'ছেলেবেলা' শিশুসাহিত্যর এক অদ্ভুত সৃষ্টি হয়ে গেছে। যা একান্তই ঘটনা তা বলবাব গুণে, বাছাই করার গুণে গল্প হয়ে গেছে। শিশুর মন গল্প শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে থাকে, যে ঘটনা সে শোনে তা জীবনের সঙ্গে মিললো কিনা, সে প্রশ্ন তার মন তোলপাড় করে না। বিশ্বাস করার অসীম ক্ষমতা তার, যা অবিশ্বাস্য তাকেও সাগ্রহে সে বিশ্বাস করে বসে। তাদেব বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে সাংসারিক জীবনে যা অতি তুচ্ছ তাও বিরাট হয়ে দাঁড়ায়। কিছুটা জানা আর কিছুটা না-জানার যে জগৎ সেই জগতের বাসিন্দাদের জন্য এই 'ছেলেবেলা'। ছেলেবেলাব সেই জগতে নানা রঙ, নানা ধ্বনির চলাফেরা, মনের মধ্যে সেই সব ধ্বনি আব বর্ণের এক জগৎ রূপকথার শ্রোতাও গড়ে স্রষ্টাও গড়ে।

"জানার সঙ্গে আরেক জানা, দূরের থেকে শোনা,
নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল বোনা,
নানারকম ধ্বনিব সঙ্গে নানান চলাফেরা,
সব দিয়ে এক হালকা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা,
ভাবনাগুলো তারই মধ্যে ফিরতো থাকি থাকি —
বানের জলে শ্যাওলা যেমন মেঘের তলে পাখী।"

এমনি করে নানা রূপ আর ধ্বনির হালকা জগতের আমেজে ভরা

'ছেলেবেলা'। কিন্তু এ শুধু শিশুর মনোরঞ্জনের জন্যই লেখা নয়। পক্ক-কেশ রবীন্দ্রনাথের মনের ভিতর যে চিরশিশু বাস করছে তারই আনন্দ যেন শিশুচিত্তের চিরকালের প্রাণ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। নিজেকে নানাভাবে আস্বাদন করা স্রষ্টার খেলা। যাঁরা কাব্যরসিক, যাঁরা কবির সৃষ্টির মূল তত্ত্বটিকে জানতে চেয়েছেন তাঁদের জন্য দিলেন 'আত্মপরিচয়', যাঁরা জীবনকথা বাদ দিয়ে নিছক কাব্যতত্ত্বে খুসী নন তাঁদের জন্য 'জীবনস্মৃতি', আর সেই রচনাকেই শিশুকল্পনার কিছুটা উপযোগী করে লেখা 'ছেলেবেলা'। নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করার, নিজেকে অনেক রকম করে দেখার খেলা কবি সারাজীবন ধরে খেলেছেন। আর কোন লেখক নিজেকে এমন বিচিত্রভাবে অনুভব করেছেন বলে জানা নেই। তাঁব সৃষ্টির অপর্যাপ্ত দান অন্যান্য অংশের মতো সাহিত্যেব এই অংশটিকেও সমৃদ্ধ কবেছে।

'আত্মপরিচয়' আত্মজীবনী সাহিত্যে একক এবং অনবদ্য। পরিণত বয়সের বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন এটি। নিজেব ব্যক্তিত্ব, নিজের কবিত্ব, নিজের ধর্মবোধ নিয়ে আলোচনাব সমষ্টি। একে সাধারণতঃ আত্মজীবনী বলতে আমরা যা বুঝি সেই পর্যায়ে ফেলা যায় না। দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের আত্ম-উদ্‌ঘাটন এই 'আত্মপরিচয়।' যে কথা নানা কবিতায়, নানা গানে; নানা নাটকে বার বার বলেছেন জীবনেব সেই গভীর উপলব্ধিগুলি, বিশ্বাসগুলি কবি নিজেব আত্মপরিচয়েব মাধ্যমে ধরে দিয়েছেন। এখানে যে রবীন্দ্রনাথকে দেখি তাতে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের স্পর্শমাত্র নেই, এ রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি আদর্শের সমষ্টি, কয়েকটি আদর্শের বোধ ও তার পরিণতির ইতিহাস। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী হচ্ছে একমাত্র গ্রন্থ যার সঙ্গে এর কিছুটা তুলনা চলে। সমস্ত জীবনের অফুরন্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে কয়েকটি কথা বার

বার বলা হয়েছে, যা তাঁর প্রথম বয়সের উচ্ছ্বাস আর পরিণত বয়সের মননশীলতার মধ্যে একটি সামঞ্জস্যস্থাপন করেছে তাকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথ নূতন কাব্য সৃষ্টি করেছেন। এ তাঁর জীবন-কথা নয়, জীবনকাব্য। যা কিছু স্পর্শ করেন তাঁর হাতে তাই কাব্য হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রকাব্যধারার সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই তাঁদের কাছে এ গ্রন্থ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। নিজের সৃষ্টিকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, দেখিয়েছেন কেমন করে তাঁর ভিতরকার সৃজনীশক্তি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে কাজ করে চলেছে তাঁর অজান্তে। সেই সৃজনীশক্তি শুধু যে তাঁর নানা কালের লেখাগুলির মধ্যেই যোগসূত্র স্থাপন করেছে তা নয়, তা প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর যোগ ঘনিষ্ঠ করেছে, অনাদিকাল থেকে যে প্রাণস্রোত চলেছে পৃথিবীতে নানাভাবে তার সঙ্গে যোগ অনুভব করিয়েছে। সেই যোগ বিভিন্ন কালের কাব্যে নাটকে ধীরে ধীরে প্রস্ফুট হয়েছে। নিজের মধ্যে সেই অখণ্ড পূর্ণতার যে অনুভূতি ক্রমশঃ গভীর হয়েছে তাকে যে কাব্যাংশগুলির মধ্য দিয়ে বুঝিয়েছেন তা তাঁর কাব্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলে বোঝা সম্ভব নয়। 'আত্মপরিচয়' তাঁর কবিত্বশক্তির ব্যাখ্যা, তাই ঐ গ্রন্থ একান্তভাবেই রবীন্দ্রকাব্যানুরাগী পাঠকদের জন্য। সাধারণ পাঠক 'জীবনস্মৃতি' পড়ে আনন্দ পাবে, কিন্তু 'আত্মপরিচয়' তাকে কতখানি আকর্ষণ করবে এ সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বাংলা সাহিত্যে এমন আর দ্বিতীয় 'আত্মপরিচয়' নেই যা লেখকের সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে না মিলিয়ে পড়লে বোঝা যাবে না।

শুধু কবিত্বকেই তিনি নিজের জীবনে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। তাঁর ধর্মবোধও তাঁর কবি-জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। শাস্ত্র-

সম্মত কোন ধর্মের ছাপ মেরে তিনি নিজেকে ক্ষুণ্ণ করেন নি। নানা অনুভূতি, বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁকে গড়ে তুলছে। সেই হয়ে ওঠার পদ্ধতিটাই তাঁর ধর্ম। চলতে চলতে থেমে যাওয়া তাঁর স্বভাবে নেই। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত তাঁর ধর্ম গড়ে উঠছে, কোন একটা জায়গায় ছাপ মেরে তাকে বিশেষ নাম দেওয়া যায় না। সে যেন "পথ চলতি পথিকের নোট বইয়ে টুকে রাখা" বিচিত্র কথার মতন। সে ক্রমশঃই নিজের চতুর্দিকে গণ্ডী ভেঙ্গে ভেঙ্গে চলেছে, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর পরিধির মধ্যে তার বিকাশ; সেই বিকাশ তার বহুকালের সুদীর্ঘ কাব্য-সাধনার মধ্যেই রয়েছে। সেই কাব্যসাধনার পরিচয় যারা পায়নি তাদের জন্য 'আত্মপরিচয়' কতখানি অর্থ বহন করবে?

'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রনাথের জীবনের মধ্যবয়সের রচনা। যখন প্রথম প্রকাশ হলো তখনও তিনি নোবেল প্রাইজ পাননি। বাইরের জগতে যে ঘটনা তাঁকে পরিচিত করলো সে ঘটনার উল্লেখ থাকা 'জীবনস্মৃতি'তে তাই সম্ভব নয়। কিন্তু 'আত্মপরিচয়ে'ও কবি সে সম্বন্ধে নীরব। কবি জীবনের অনেক কথা আলোচনা করেছেন, কিন্তু লোকমত, লোকপ্রশংসা তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। 'আত্ম-পরিচয়ে'র প্রবন্ধে তিনি জীবনের ঘটনা নয়, জীবন-বিশ্বাসের কথা বলেছেন। অধিকাংশ প্রবন্ধই কোন তাগিদে লেখা, না হয় কোন সমালোচনার উত্তর দিতে লেখা। নানা পত্রিকায় তাঁর লেখার তখন আলোচনা সমালোচনা বেরুচ্ছে। সেই লেখাগুলো তাঁকে আঘাত করেছে। সমালোচনাকে যে তিনি আঘাত মনে করে ক্ষুব্ধ হয়েছেন তা নয়। অনেক জায়গাতেই নিদারুণ অশোভনতা, অশালীনতা তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছে। তাঁকে লেখনী ধরতে বাধ্য করেছে। প্রবন্ধ-গুলির পিছনকার ইতিহাস আলোচনা করলেই এ কথা স্পষ্ট হবে।

'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। জীবন-বৃত্তান্ত লেখার অনুরোধ এসেছিল। কবি নিজের জীবনবৃত্তান্ত সাধারণের কাছে তুলে ধরার কোন অর্থ দেখেন নি। তাই নিজের "সুদীর্ঘ কালের কবিতা লেখার ধারা"র সমালোচনা করেছেন এবং আগে থেকেই এ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে কেউ কেউ তাঁর কাব্যধারার আলোচনার মধ্যে অহমিকার সন্ধান পেতে পারে। এ আশঙ্কা মিথ্যে হয়নি। এই প্রবন্ধকে কেন্দ্র করেই দ্বিজেন্দ্রলাল আক্রমণ করলেন রবীন্দ্রনাথকে, এ প্রবন্ধে খুঁজে পেলেন কবির দম্ভ ও অহমিকা। নিজের কাব্যধারার সঙ্গে জীবনকে একাত্ম করে দেখার এই অভিনব দৃষ্টি কবির আগে বাংলা সাহিত্যে আর কারুর ছিল না। তাই এই আত্মসমালোচনা, নিজেকে নিজের কাব্যে খুঁজে পাওয়ার এই চেষ্টা অনেকের কাছেই আত্মপ্রচার বলে মনে হয়েছিল। তার উত্তরে কবি বলেছিলেন, বিশ্বশক্তি আমার মধ্যে কাজ করছে, সেই অনুভূতি যখন হঠাৎ বিশেষ অবস্থায় নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়, তখন সেই উপলব্ধিকে প্রকাশ করা কি অহংকার, সে কি দম্ভ? হঠাৎ যখন মানুষ আবিষ্কার করে বসে যে একটি চেতনা তার সত্তাকে সমস্ত কথায় সমস্ত কাজে পরিচালিত করছে তখন সেই কথাটিকে প্রকাশ না করে তার উপায় কি। নিজের সেই গভীর উপলব্ধির যে কাহিনী তাই হলো 'আত্মপরিচয়ে'র প্রথম প্রবন্ধের কথা।

পঞ্চাশ বছর যখন পূর্ণ হলো তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁকে কবিসংবর্ধনা দেয়। সেখানে যে অভিভাষণটি পড়েছিলেন, সেটিই 'আত্মপরিচয়ে'র দ্বিতীয় প্রবন্ধ হয়েছে। এই প্রবন্ধে ব্যক্তি ও কবির সম্পর্কে তাঁর মতামত বলেছেন। কবির খ্যাতি ব্যক্তি দাবী করে, যে প্রতিদিনকার তুচ্ছ মানুষ সে স্রষ্টার সকল সম্মানের ভাগীদার হতে চায়।

কবি তাই ঐ অভিভাষণের প্রত্যুত্তরে বার বার বলেছেন কবির সম্মানে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অহংবোধ তিনি তৃপ্ত হতে দেবেন না।

তাঁর ধর্মমত নিয়ে সেদিন যে বিতর্কের সুরু হয়েছিল সেই বিতর্কের ফলেই তিনি 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'প্রবর্ত্তক' কাগজে প্রকাশিত 'ধর্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ সম্বন্ধে কবি বলছেন "সম্প্রতি কোন কাগজে একটি সমালোচনা বেরিয়েছে, তাতে জানা গেল আমার মধ্যে একটি ধর্মতত্ত্ব আছে এবং সেই তত্ত্বটি বিশেষ শ্রেণীর।" তাঁর ধর্ম যে তাঁর জীবনের মূলে আর সে জীবন যে এখনো চলছে—এই কথাটিই এই প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন।

সত্তর বছর পূর্ণ হলে কবি যে অভিভাষণ শান্তিনিকেতনে দিলেন তা আত্মপরিচয়ের চতুর্থ প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে বল্লেন যে শাস্ত্রজ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞানী হবার বাসনা তাঁর কোনদিনই ছিলনা, চিত্তকে আনন্দে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টাতেই তাঁর সার্থকতা। লোকালয়ের খ্যাতির হবির লুঠে তাঁর লোভ নেই। তিনি ভাঙা ভাঁড়ে রস জুগিয়েই খুশী।

সত্তর বছর পূর্ণ হতে কলকাতায় যে অভিনন্দনের আয়োজন হলো তারই উত্তরে পঞ্চম প্রবন্ধ পড়েছেন আর আশী বছরের সূচনাতে ষষ্ঠ প্রবন্ধ লিখেছেন। পরিণত বয়সের এই প্রবন্ধ দুটিতে জীবনের যে সমস্ত গভীর অনুভূতির কথা লিখেছেন তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো। নিজের কবি-জীবনের ধারাটিকে উদ্ধার করে এবং আরও বিভিন্ন উপলব্ধির ব্যাখ্যা ও আলোচনা করে আত্মপরিচয়ের মধ্যে কবি নিজের এক বিচিত্র জীবনের ইতিহাস রচনা করেছেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁর মূল বক্তব্য যা, আলোচনার সুবিধার জন্য সেগুলিকে নীচে সাজিয়ে দেওয়া হলো।

প্রথম প্রবন্ধের মূল কথা হলো—নিজের বিচ্ছিন্ন কাব্য রচনার প্রচেষ্টার খণ্ড তাৎপর্যই এতদিন জেনে এসেছেন; যেটা যখন লিখেছিলেন সেইটেকেই পরিণাম বলে মনে হয়েছে। কিন্তু ক্রমশঃ এই বোধ স্পষ্ট হলো যে তাঁর ভিতরে কাজ করে চলেছেন আর একজন রচনাকারী যিনি সমস্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড কাব্যসৃষ্টির প্রচেষ্টাগুলিকে একটি সমগ্রের যোগে বেঁধে তাদের একটি অখণ্ড পরিণতি দিচ্ছেন। শুধু যে কবি-জীবনের পূর্ণতা তিনি দিচ্ছেন তা নয়, সমগ্র জীবনের সুখদুঃখ যোগ-বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে এক পরিপূর্ণ তাৎপর্যে তিনি গেথে তুলছেন। কবির ভিতরে এই যে কবি তাঁকেই তিনি জীবনদেবতা বলেছেন। কিন্তু এই জীবনদেবতা শুধু জীবনটিকেই একটি সমগ্রতা দিয়েছেন তা নয়, অনাদিকাল ধরে যে প্রাণের স্রোত চলেছে সেই "প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।" এ জীবনদেবতা কে, তা নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই জীবনদেবতা তাঁর অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি। পরবর্তী কালে 'চিত্রা'র ভূমিকায় বলেছেন এ জীবনদেবতা ভগবান নন। এ তত্ত্ব নিয়ে সুবিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে কম। যে কথাটি আলোচ্য তা হলো এই যে কবি তাঁর কবিত্বের গোপন তত্ত্বটি আমাদের কাছে বলাকেই তাঁর আত্মপরিচয় বলে মনে করেছেন। নিজের ভিতরে আর এক যে কবি রয়েছেন তাকে জেনেছেন বহুকাল ধরে। বহু লেখায় তার আভাস ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। সেই লেখাগুলি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন কেমন করে এই অন্তর্নিহিত সৃজনাশক্তির, এই জীবনদেবতার বিকাশ হলো জীবনে, বিশ্বের বৃহৎ প্রাণ-প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হলো তার প্রাণ। প্রকৃতি তাঁকে আকর্ষণ করেছে, মানুষ তাঁকে মুগ্ধ করেছে, কবি মোহ মনে

করে দূরে সরে থাকেন নি। তিনি যে এই পৃথিবীর রূপের মধ্যেই অরূপের সন্ধান করেছেন, তিনি যে পৃথিবীর সৌন্দর্য আর প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্যেই ভগবানকে খুঁজেছেন, এই কথাটি বার বার বলেছেন।

নিজেকে বোঝাতে গিয়ে নিজের যে রূপটি কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে তাকেই কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জগৎকে দেখেছেন তাকে জানবার চেষ্টা করেছেন। সেই পরিচয় মনের ভিতর নূতন জগতের সৃষ্টি করে, কবির মধ্যে বিশ্ব বাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেই প্রকাশই কবির জীবন। এই প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যাহা অশরীরী ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে, তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্তি লাভ করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে, তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা—

বাহির হইতে দেখোনা এমন করে
আমায় দেখোনা বাহিরে।
আমায় পাবেনা আমার দুখে ও সুখে
আমার বেদনা খুঁজোনা আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবেনা আমার মুখে
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।"

কবি যে নিজের কবিসত্তার জীবনকে বাইরের জীবন থেকে সুনিশ্চিতভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন সে কথা আত্মপরিচয়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধেও বলেছেন। যে মানুষ সংসারের গতানুগতিকতার সূত্রে

বাঁধা তাকে তো তিনি কবি বলে স্বীকার করেন নি। তাই সাহিত্য-পরিষদের অভিনন্দনের উত্তরে বলেছেন "কবি যতবড় কবিই হউক তার সমস্তটাই কবি নয়। তাহার সঙ্গে যে একটি অহং লাগিয়া থাকে সকলতাতেই সে আপনার ভাগ বসাইতে চায়। তাহার বিশ্বাস, কৃতিত্ব সমস্ত তাহারই; এধং কবিত্বের গৌরব তাহারই প্রাপ্য।" আত্মজীবনী সম্বন্ধে কবির ধারণা একই, সেখানেও বলছেন,

"মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে
যাহারে কাঁপায় স্তুতি নিন্দার জ্বরে
কবিরে খুঁজিছ তাহার জীবনচরিতে ?"

নিজের কবি-জীবনের অভিজ্ঞতার কথা দ্বিতীয় প্রবন্ধে বলেছেন। নিজেব জীবনে যত সৃষ্টি করেছেন সব সৃষ্টি যে অমরত্বের তরণীতে স্থান পাবে এমন কথা কিছুই নেই। তাই তাঁর দান যে অনেকাংশে ক্ষণস্থায়ী এ কথা নিজেই বুঝেছেন। খেয়ালখুসীতে অনেক লেখা লিখেছেন, কিন্তু চিরকাল মনে একটা সান্ত্বনা ছিল। জনসাধারণের মন ভোলাবাব জন্য, সস্তা করতালির লোভে কখনও কিছু লেখেন নি। এইখানেই তাঁর জীবনের এক বিচিত্র রসেব উদ্ঘাটন। আধুনিক যুগে সাহিত্যের এক নূতন তত্ত্ব শোনা যাচ্ছে—জনসাধারণের জন্যই সাহিত্য। সাহিত্য আরও অন্যান্য শিল্পবস্তুর মত দেশবাসীর সম্পত্তি এই অর্থে কথাটা ব্যবহৃত হয়না। কথাটা এই অর্থে বলা হয় যে সাহিত্য জনসাধারণের বোধগম্য হওয়া চাই, জনতার সুখ-দুঃখের সঙ্গে সমানতালে তার ছন্দ বাজা চাই। আধুনিক সাহিত্যে তাই জনসাধারণের সুখ-দুঃখের নামে জনসাধারণের মনের মত সৃষ্টির প্রাচুর্য। এ সাহিত্য বর্তমানে সাহিত্যিককে সম্মান দেয়, কিন্তু কালের দরবারে ঝরাপাতার মতোই এ অল্পায়ু। সাহিত্যিক বা

শিল্পী মানুষের সাধারণ চিন্তার সঙ্গে উচ্ছ্বাস ও আবেগের সুর মেলায় না। নিজের আবেগ উচ্ছ্বাস ও চিন্তাকে তিনি নিজের বিশেষ দৃষ্টিতে সর্বকালের করে তোলেন। তা সাধারণ মানুষের ভাল নাও লাগতে পারে। সস্তা যশের লোভে সাহিত্যধর্মকে তিনি সর্বসাধারণের ফরমাশের অধীন করে তোলেননি। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, কোন মহৎস্রষ্টাই বর্তমানের করতালির জন্য নিজের বিশ্বাসকে সর্বজন-আদৃত করে তোলার চেষ্টা করেন নি। তাই তিনি বলেছেন "সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবী করিয়াছে তাহা যোগাইতে চেষ্টা করি নাই।" "কলরব মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে" আসন পাতার বাসনা তাঁর ছিল না দেশের জন্য ভালবাসা ছিল বলেই দেশের মানুষকে কোন মিথ্যা উপহার তিনি দেননি। তাঁর সাহিত্য রচনার ইতিহাসে এ ঘটনা অল্পমূল্য নয়।

'আত্মপরিচয়ে'র তৃতীয় প্রবন্ধ তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে। তাঁর জীবনের মূলে যে তত্ত্ব কাজ করছে সেই তত্ত্বটি তাঁব কাব্য রচনার মধ্যে কেমন করে প্রকাশিত হয়েছে তা এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন। "মানুষের ধর্ম" আলোচনায় তিনি যে কথা বলেছেন সেই কথাই তিনি নিজের ধর্মালোচনা করতে গিয়েও বলেছেন। তাঁর ধর্ম কি, এই প্রশ্ন তখনকার সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধের পাতায় উঠেছে। তাঁর ধর্মসঙ্গীতের উপর বিপিন পাল প্রবন্ধ লিখেছেন 'বিজয়া'য়। 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় প্রবন্ধ বেরুলো 'ধর্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ'। তাঁর উপরে যখন বিশেষ একটা মতের ছাপ মেরে দেওয়া হলো তখন তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। তাই নিজের ধর্ম কি সেই আলোচনা করতে তাঁকে লেখনী ধরতে হলো। যেমন করে নিজের জীবনের সকল কথা সুন্দর করে তুলে ধরেছেন তেমন করে নিজের ধর্মবোধের কথাও বলেছেন।

ধর্মসাধক যাঁরা নন তাঁদের ধর্মপরিচয় শোনার জন্য পাঠকের বিশেষ আগ্রহ থাকার কোন কারণ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ওঠে না। কারণ জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ধর্ম গড়ে উঠেছে, তিনি যা হয়ে উঠেছেন তাই তাঁর ধর্ম। অন্তর্নিহিত যে প্রাণশক্তি আমাদের গড়ে তোলে তাই আমাদের ধর্ম। কোথাও একটা দাঁড়ি টেনে দিয়ে শেষ কথা বলা যায় এ তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাই বলেছিলেন—

"পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।"

প্রকৃতির আশ্রয়ে যতদিন কেটেছে ততদিন একটা ভাবের মাধুর্যে উদ্বেল হয়েছিলেন। সেই আশ্রয় থেকে বেরিয়ে যখন সংসারের সঙ্গে মুখোমুখী পরিচয় হলো তখন নিজের ভিতরের বৃহত্তর সত্তা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। প্রতিদিনকার তুচ্ছতার গ্লানি মুছে কবির জীবনে সেই বৃহৎ সত্তার আবির্ভাব হলো। তাকে প্রথম পেলেন 'সোনার তরী'র 'বিশ্বনৃত্যে'। অতি অস্ফুট তার আবির্ভাব, তবু মনে হলো নিজেকে অনেক দুঃখের মূল্য দিয়ে জানতে হবে। সেই বেদনাতেই ধর্মবোধের জন্ম। তারপর 'নৈবেদ্য কাব্যে' বললেন প্রকৃতির স্পর্শমোহ যদি দূরে গিয়ে থাকে তবে দুঃখ নেই। "আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।" তারপর 'চিত্রা'য় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় বিরাট মানবচিত্তের সঙ্গে যোগ স্থাপিত হলো। যার অভিসার সে যে কে তাও কবির ভাল করে জানা হয়নি। কিন্তু তারই জন্য যুগযুগান্তর ধরে মানবযাত্রী চলেছে ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে। এমনি করে নিজের মধ্যে অশেষের আহ্বান এলো, ললিত সুরে বাঁশী বাজানো আর নয়, শক্তির আহ্বান সুরু হলো—"কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক, রস-সম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়—

কাঁপিবে না ক্লান্তকর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি
দীপ নিভিবে না।"

এমনি করে নিজের মধ্যে ডাক শুনেছেন, মন ভরে সাড়া দিয়েছেন, প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে নবীন প্রভাতের অপেক্ষায় দীর্ঘ রাত্রি জেগে থাকার। কিন্তু পথের নিশানা তখনো সঠিক কিছু জানা গেল না, চেতন-লোকের আলোকে অবচেতন থেকে যে ধর্ম উঠে আসছে তার মূর্তি তখনো অস্পষ্ট। "ধর্মকে নিজের মধ্যেই উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ীর শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তারপর জীবনে সুখ পাই আর না-পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।" জীবনের এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিময় মাধুর্যের আসন ছিন্নভিন্ন করে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল। সেই রুদ্রবেশী দেবতাকে কবি ঝড়ের বেশে দেখেছেন, সেই দুর্দম, নিশ্চিত নূতন নিষ্ঠুরকে তিনি জীবনে আহ্বান করেছেন। তাকেই বলেছেন—

"হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী
করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াব উঠে, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব
অর্পিব পরাণ।"

এই দুঃখবাহনকে তিনি চেয়েছেন, দুঃখই যে চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখে। মোহের আবেশ থেকে, ভাবের আবিলতা থেকে দুঃখ আমাদের ত্রাণ করে। তাই বলেছেন "পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ

দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়...অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান্ করিতেছে। যখন পরিচয় পাই তখনই রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।" সেই ললিত মাধুর্যের শেষে ধীরে ধীরে সেই রুদ্রের আবির্ভাব স্পষ্ট হতে লাগলো। যখন শান্তিতে আরামে মানুষ গভীর ঘুমে অচেতন, যখন চেতনা ঢাকা পড়ে আছে নানা দুর্বলতায় তখন আরামের ব্যাঘাত ঘটিয়ে শান্তিশয়ন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে এলেন রাজা—অশান্তির রাজা; শূন্যতলে তখন বজ্র ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঝড়ের সাথে দুঃখরাতের রাজা এলেন। 'খেয়া' কাব্যে এই রাজার আবির্ভাব। সেই সময়ের বহু গানে এই অশান্তির সুর বেজেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে আবার এই বোধও এলো যে রুদ্রতাই রুদ্রের শেষ কথা নয়, তাই রুদ্রের সেই প্রসন্ন দৃষ্টিও তিনি নিজের মধ্যে পেয়েছেন।

এমনি করে কাব্য আলোচনা শেষ করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে ঐ রুদ্রের আশীর্বাদ কেমন করে তাঁর নাটকেও পড়েছে। দুঃখের দেবতা ঐ নাটকগুলির ভিতরে দুঃখের আঘাত দিয়ে দিয়ে মানুষের চিত্তকে জাগ্রত করেছেন কিন্তু আনন্দ হরণ করেন নি, তাঁর প্রেম আঘাত করে কিন্তু অবহেলা করে না, "তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইকো অবহেলা।"

ধর্ম তাঁর শেষ পর্যন্ত কোন একটা বিশেষ বাঁধনে বাঁধা পড়েনি। জীবনে নানা সুখদুঃখকে এক মহৎ সামঞ্জস্যের মধ্যে পেয়েছেন, সেই পাওয়ার মধ্যে ধর্মবোধ ক্রমপরিণতি লাভ করে চলেছে। উপনিষদের যে মন্ত্র মহর্ষির কাছ থেকে পেয়েছিলেন সেই মন্ত্রকে সারাজীবন ধরে সত্য করে তুলেছেন। একদিকে জীবনের প্রতি সুগভীর আসক্তি

অন্যদিকে নিজের বৃহত্তর সত্তাকে জানবার একটা প্রগাঢ় বাসনা—একদিকে নিবিড়ভাবে সংসারকে পাওয়ার ইচ্ছা অন্যদিকে সংসার-ব্যাপ্ত সেই মহতো মহীয়ানকে অনুভব করার ব্যাকুল আকুতি। বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করা এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করা। এই ধর্মই তাঁর ধর্ম, সে তাঁর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে, পরিণত হতে থাকে। মহর্ষি তাঁর জীবনে যে ধর্মসাধনা করেছেন সেও কোন বাঁধা পথে নয়। উদার মন চলতে চলতে নিজেকে আবিষ্কার করেছে। সেই সাধনার প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। মহর্ষির 'আত্মজীবনী' আর রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়' একই ধারার দুটি প্রকাশ। মহর্ষির 'আত্ম-জীবনী' বাংলার ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের ভাবগত ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়' বাংলার মহত্তম কবিপ্রতিভার কাব্যসৃষ্টির ভূমিকা। 'আমার ধর্ম' যেমন কবির জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা তেমনি তাঁর কাব্যালোচনাও বটে। তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে যে জীবন প্রকাশিত হয়েছে তিনি তারই সমালোচনা করেছেন; কাব্যতত্ত্বের ভিতরকার কথা উদ্‌ঘাটিত করে কাব্যানুরাগীদের কাছে তাঁর কবি-মানসের সৃষ্টি-রহস্যের পরিচয় দিয়েছেন।

শাস্ত্র, তত্ত্ব নিয়ে তাঁর কাজ অতি অল্পই। শাস্ত্র, তত্ত্ব অনেক পড়েছেন, কিন্তু জীবনে বিমুগ্ধনেত্রে যে রূপের লীলা দেখেছেন তাতেই মন ভরেছে—"লাগলো ভালো মন ভোলালো, সেই কথাটাই গেয়ে বেড়াই, দিনে রাতে সময় কোথা কাজের কথা তাইতো এড়াই।" বিশ্ব-সংসারে যে আনন্দপ্রবাহ চলছে তারই দান নেবার জন্য তিনি হাত পেতে আছেন। তিনি যোগী নন, তিনি দার্শনিক নন, তিনি কবি। নানা কাজ জীবনে করেছেন, কোথাও যেন নিজের পূর্ণতা

পাননি। তিনি বিচিত্রের দূত। একটা গভীর সৌন্দর্য অনুভূতি তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে বার বার। প্রতিদিন সংসারে যে অফুরন্ত রসের ঝরণা বয়ে চলেছে তিনি তারই মধ্যে অবগাহন করেন—"বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ।" নিজের কথা রবীন্দ্রনাথের মত করে পৃথিবীর আর কোন কবি বোধহয় বলেন নি। তাঁর মনের নানা দ্বার উদ্ঘাটিত করে তিনি নিজেকে সহজ করে চিনিয়ে গেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় ঐখানেই, যে জীবনকে ভালবেসেছেন, সেই কথাটাই বার বার বলেছেন, পুরস্কারের কবির কথা যেন তাঁরই কথা—

"সংসার মাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
কয়েকটি কাঁটা করি দিয়া দূর
তারপর ছুটি নেব।"

কোন বাঁধাধরা উদ্দেশ্য তাঁকে চালাতে পারে নি—আর্তত্রাণের কঠিন ব্রত নিয়ে নিজেকে তিনি অমর করতে চাননি, জ্ঞানদানের বাসনাও ছিল না, তিনি তাঁর অপ্রয়োজনের উচ্ছ্বাস নিয়ে রূপের মালঞ্চে মালাকর হয়ে বসেছেন। তাই নিজের সমস্ত প্রাণমনের সবটুকু আবেগ ঢেলে কবি বলেন "এই ধুলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি-ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।" আর সব পরিচয় লুপ্ত হোক কিন্তু এই পরিচয়টুকু থাক যে পৃথিবীকে আমি ভালবেসেছিলাম, কুসুমিত তরুতলে তরুণ-তরুণী অশোকচয়নে ব্যস্ত, তারা জানুক 'আমি তোমাদেরই লোক'। তোমাদের

এই হাসি খেলায় আমি যে গান গেয়েছি সেই কথাটি মনে রেখো। সংসারকে কোন তত্ত্ব নয়, কোন দর্শন নয়, কোন মহৎ কীর্তি নয়, দিয়ে গেলুম কিছু গান। 'সাহিত্যের পথে'তে সাহিত্য প্রবন্ধটিতেও বলেছেন যে সৃষ্টির শেষ কথাই হচ্ছে আনন্দ। সেই আনন্দকে প্রকাশ করাই তাঁর কাজ। শেষ জীবনের সমস্ত কাব্য জুড়ে ঐ কথাটাই বার বার বলেছেন যে এত রূপ এত গান ভাল লাগলো, সহজকেই যেন আমার শেষ প্রণাম জানিয়ে যেতে পারি। বিশ্লেষণ নয়, বর্ণনা নয়, হিসাব নয়, শুধু প্রাণ খুলে বলা, ভাল লাগলো। তারই মধ্যে তাঁর পরিচয় রইলো—তাইতো জীবনের অনেক স্মরণীয় ঘটনা বলা হলো না, কিন্তু বার বার বলা হলো ঐ ভাল লাগার কথাটা।

পঞ্চম প্রবন্ধে সাবেক কালের কলকাতা আর বাড়ীর কথা বলেছেন। যে পরিবেশ বাল্যকালের দিনগুলিকে জুড়ে ছিল তার ছবি নয়, তার ব্যাখ্যা। ঊনবিংশ শতাব্দীর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর আসল চেহারাটা কি ছিল, বিগতবিত্ত অনুশাসনবিরোধী জীবন কেমন করে নূতন সৃষ্টির নিত্য নব প্রেরণা স্রষ্টাদের মনে এনে দিতো তার কিছু আলোচনা পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ যখন সে বাড়ীতে এসেছেন তখন সে কাল বিদায় নিয়েছে, পূর্বতন ধনের স্রোতে ভাঁটা পড়েছে কিন্তু প্রাণ স্তিমিত হয়নি। জীবনের নানা ক্ষেত্রে এই বাড়ীর লোকেরা নিজেদের অশোভন বিকৃতি থেকে বাঁচিয়েছেন। দেশের সর্বত্র যখন ইংরাজীর অবাধ চর্চা চলছে তখন বাংলা ভাষার প্রতি সুগভীর অনুরাগ দেখা গেছে এই বাড়ীতে। পিতৃদেব মহর্ষির শান্ত সমাহিত উপাসনায় উপনিষদের শ্লোক অনর্গল আবৃত্তি করতে হয়েছে, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে ঐ মন্ত্রের মাধ্যমে প্রথম যোগ হলো। কিন্তু ভারতীয়ত্বের অভিমান

কোনদিন ছিল না তাঁদের, তাই একদিকে উপনিষদ্ অন্যদিকে ইংরাজীর সাহিত্যের আনন্দস্রোত চলেছে বাড়ীতে। বাড়ীর ছেলেরা দেশাত্মবোধক গান লিখেছেন. গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন। সেই নবজাগরণের দিনে কিছু বর্জন বা কিছু গ্রহণ করার মধ্যে অনর্থক উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য ছিলনা কোথাও। প্রাচীনকথাকে রবীন্দ্রনাথ কখনও আধুনিককালের উদ্দেশ্যসাধনের কাজে লাগান নি। তাই পুরানো ঠাকুরবাড়ীর কথা বলতে বসে অসংযত উচ্ছ্বাসের আবেগ তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। সংযত বুদ্ধির বিশ্লেষণ দিয়ে তিনি বিচার করে দেখান সেই পরিবেশটিকে যার মধ্যে তাঁর আগমন সম্ভব হয়েছিল। সেদিনকার কলকাতা তাঁর কল্পনার লীলাচাঞ্চল্যকে বাধা দেয়নি। সেই কথা বোঝানোর জন্য তিনি বাস্তব কলকাতার বর্ণনা দেননি। যে কলকাতা তার মনের ভিতর কল্পনার রাজ্য বিছিয়ে বসেছিল তারই ছবি এঁকেছেন। এই কলকাতা ইতিহাসে নেই, এ ছিল তাঁরই কল্পনায় — "কলকাতা শহরের বক্ষ তখনো পাথরে বাঁধানো হয়নি, অনেকখানি কাঁচা ছিল! তেলকলের ধোঁয়ায় আকাশের মুখে তখনো কালি পড়েনি। ইমারত-অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেলবেলা অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়তো, হাওয়ায় দুলতো নারকেলগাছের পত্র ঝালর, বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝরণার মতো ঝরে পড়তো আমাদের দখিনবাগানের পুকুরে, মাঝে মাঝে গলি থেকে পাল্কী বেহারার হাঁইহুই শব্দ আসতো কানে আর বড়রাস্তা থেকে সহিসের হেইয়ো হাঁক, সন্ধ্যাবেলায় জ্বলতো তেলের প্রদীপ তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ী দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা।" 'জীবন স্মৃতি'র আলোচনায় দেখেছি যে শ্রুতি আর দৃষ্টির জগৎ তাঁর শিশুকালকে কেমন করে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে রেখেছিল!

বাইরের আকাশে ছাড়া পাওয়া মন স্কুলের আকাশেও বাঁধা পড়েনি।

হালকা শাসনের মধ্যে ছেলেমানুষী খেয়ালের স্রোতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছন্দে কাব্যের ফুল ভেসে আসতো লাগলো। কোথাও বাঁধন নেই। প্রাচীন ঐশ্বর্যের সংস্কার নেই, প্রাচীনত্বের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ নেই। নূতন চিন্তা, নূতন ভাবধারার স্রোতের জন্য আছে অবাধ আমন্ত্রণ, শিক্ষার কঠিন রীতি বাধা দেয়নি কোথাও। উধাও প্রাণ আপন সৃষ্টির আনন্দে মেতে ওঠে। "রীতিভঙ্গের ঝোঁকটা ছিল সেই একঘরে ছেলের মজ্জাগত।"

সাহিত্যজীবনে যাঁদের কাছে প্রথমে তাঁর বিচার হয়েছে তাঁরা প্রশ্রয় না দিলেও আঘাত করেন নি। তারই ফলে "প্রকৃতির শুশ্রূষায় ও আত্মীয়দের স্নেহের ঘনচ্ছায়ায়" খ্যাতিহীনতার স্নিগ্ধ প্রথম প্রহর কেটে গেল। কিন্তু খ্যাতি যেদিন এলো গ্লানির বোঝাও সঙ্গে সঙ্গে তেমনি ভারী হয়ে উঠলো। খ্যাতি যত পেয়েছেন অসম্মান তার চেয়ে কম পাননি। কিন্তু রুদ্রের মূর্তি দেখার জন্য যে কবি প্রকৃতির স্নিগ্ধচ্ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন ঐ অসম্মাননা তাঁকে লাঞ্ছনা দিলেও পরাভব দেয়নি। সেইটেই তাঁর জীবনে বড় কথা। কে কোথায় কখন অসম্মান করলো সে প্রশ্ন তুচ্ছ। বড় কথা হলো এই যে সেই খ্যাতি আর সেই গ্লানি শেষ পর্যন্ত জীবনে কোন সঞ্চয় দিয়ে গেল কিনা। তাই বলেছেন "এমন অনবরত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোন সাহিত্যিককেই সইতে হয়নি। এও আমার খ্যাতি পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি। একথা বলার সুযোগ পেয়েছি যে প্রতিকূল পরীক্ষার ভাগ্য আমাকে লাঞ্ছিত করেছে, কিন্তু পরাভবের অগৌরবে লজ্জিত হইনি।"

দেশের সঙ্গে সাহিত্যিকের, কবির, শিল্পীর সম্বন্ধ কি? যে কবি পূর্ণতার সন্ধানে চলেছেন তাকে দেশ কেমন করে গ্রহণ করে। সুদীর্ঘকালের কাব্যসাধনায় পুনরাবৃত্তি তাঁরও কিছু হয়েছে বৈকি। কিন্তু পূর্ণতা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ তাঁকে পূর্ণ করে তোলার দায়িত্ব তাঁর একার নয়, দেশেরও বটে। দেশ চিন্ময়। তার প্রকাশ তার মানুষের বেঁচে থাকায় তার সাধকদের সাধনায়। তাঁর মধ্যে যদি দেশের কোন সাধনা পূর্ণ হয়ে থাকে তবেই তিনি নিজের জীবনে পাওয়া সকল সম্মান সার্থক বলে অনুভব করবেন। যুগবদলের ফলে নানা প্রয়োজন আজ সমস্যা সমাধানের দরখাস্ত নিয়ে ঢুকে পড়েছে সাহিত্যে। ফলে এই প্রয়োজনের যুগে আশু প্রয়োজন মিটানোর দাবী সাহিত্যের উপরেও এসে পড়েছে। দরদ আর প্রীতির চেয়ে যেখানে প্রয়োজনের তাড়না বড় হয়ে দাড়ায় সেখানে সাহিত্যে সকাল বিকাল রুচি বদল হয়। এই বেগের মধ্যে পড়ে একদিন মনে খ্যাতি অখ্যাতির দ্বন্দ্ব উঠেছিল, কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে যাবার সময় যখন হলো তখন মনের ভিতরে শান্তির কামনা জেগেছে, যে শান্তি ওই খ্যাতি অখ্যাতির দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত হবে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন এসেছে—কবির কাজ কি? মানুষের ভিতরে যে চৈতন্য তাকে জাগিয়ে "ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করাই" কবির কাজ। যে মানুষ নিজের অস্তিত্বকে নিজের প্রকাশকে ভুলে বসে আছে তাকে তার সম্বন্ধে তার প্রকাশ সম্বন্ধে জাগিয়ে তোলা কবির কাজ। কবির মন সমস্ত বিশ্বের দিকে মেলে দেওয়া—নানা ভাবনা আর অনুভূতির তরঙ্গ সেখানে নিত্যই উঠছে। মানুষের চিত্তকে যে কবি সেই অনুভূতি দিয়ে জাগিয়ে তুলতে পারেন, তিনিই কবি। আনন্দের ভাণ্ডারী তিনি, আনন্দের টানে যা টানে না তাতে তাঁর মন

আত্মীয়তা অনুভব করেনি। প্রাণের অফুরন্ত প্রাচুর্যে তিনি পূর্ণ তাই পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর কাছে কখনো পুরানো হলো না।

সাহিত্যের সকল বিভাগ তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছে। আত্ম-জীবনী লেখার আদর্শও তিনি দিয়েছেন। নিজের জীবনের হয়ে ওঠাটাই যে নিজের সত্যকার পরিচয় এ কথা তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র মধ্য দিয়ে আমাদের বুঝিয়েছেন। সংসারে যেটা প্রত্যক্ষ সেটা স্বভাবতঃই প্রাধান্য পেয়ে বসে আমাদেব কাছে। কিন্তু ঋষিকবি বলেছেন অর্ধেক দিয়ে জগৎ সৃষ্টি হলে "তদস্যার্ধ কতমঃ স কেতুঃ"— বাকী অর্ধেক কোথায় যায়। রবীন্দ্রনাথ একটি উত্তর দিয়েছেন বাকী অর্ধেক অপ্রত্যক্ষ, বস্তুপুঞ্জ-উত্তীর্ণ অনির্বচনীয়। সেই অনির্বচনীয়ের ধ্যানে তাঁর দিন কেটেছে; এই সীমার মধ্যে সেই অসীমের স্পর্শ পেয়ে তিনি আনন্দিত হয়েছেন। প্রয়োজনোত্তর যা তাকেই তিনি আনন্দসৃষ্টির মূল প্রেরণা বলে মনে করেছেন। নিজের জীবনের যে অংশটী ছিল বর্তমানের তার ইতিহাস তাই তাঁর কাছে নিরর্থক। পরবর্তী যুগের কাছে তাঁর মূল্য থাকবে তাঁর সৃষ্টিতে, সেই সৃষ্টির মূলে যে স্রষ্টা নিজের মধ্যে সৃষ্টিরহস্যের কিছু কিছু অনুভব করেছেন তিনিই এখানে বাঙ্ময়। কবি কাব্যকে জীবন মনে করেছেন সেই কাব্যকেই সমালোচনা করেচের্ন। 'আত্মপরিচয়' রবীন্দ্র-কবি-মানস-পরিক্রমা, কবি রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচিতি ও আত্মঘোষণা।

আপন কথা—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'জীবনস্মৃতি'র সুরুতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে কোন এক অজানা চিত্রকর স্মৃতির পটে ছবি এঁকে রেখে গেছে—কেন যে এঁকেছে তাও সেই চিত্রকরের মতই অজানা। অনেক দূরে দাঁড়িয়ে জীবনের ঘটে-যাওয়া অতি বাস্তব ঘটনাগুলো যেন চমৎকার ছবির মতো ভেসে ওঠে —পথিক যে পান্থশালায় থাকে সে পান্থশালা ছবি নয়, কিন্তু "যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে, তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়।" ছোটবেলার অতিবাস্তব দিনগুলো ভবিষ্যৎ জীবনে ছবির মতো মনে পড়ে। তুলির শিল্পী লেখনীর শিল্পী হয়ে সেই ছবি এঁকে রেখেছেন।

আত্মজীবনী রচনার প্রেরণা মানুষের জীবনে নানাভাবে আসে। বন্ধুজনের উপরোধ, আত্মপ্রকাশের সুগভীর বাসনা, কোন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক চিত্র রচনা, আপন উপলব্ধির ইতিহাস ব্যক্ত করা—সবই আত্মজীবনী-রচনার প্রেরণা যোগাতে পারে। নিজেকে ব্যক্ত করার যে গোপন তাড়না তা প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কোন না কোন দিন ধাক্কা দিয়েছে। শিল্পীর শিল্পসাধনাও এই আত্মপ্রকাশের বাসনার পথ ধরেই আসে। শিল্পী-মনের যে পরিচয় শিল্পবস্তুর মধ্যে রয়েছে শিল্পী তাকেই নিজের জীবন বলে দাবী করেন। শিল্পের বিকাশই তাঁর জীবনের বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ তাই আত্মপরিচয় ঘোষণা করতে গিয়ে তাঁর ভাবপরিণতির ইতিহাস দিয়েছেন—ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের সুখদুঃখকে ছাপিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের আত্ম-উপলব্ধির ইতিহাসই তাঁর আত্মপরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আত্মজীবনীর যত রকম শ্রেণীভেদ করা যায় তার কোনটাতেই ফেলা যায় না অবনীন্দ্রনাথের 'আপন কথা'কে। 'আপন কথা' একাই একটি শ্রেণী, ইংরাজীতে বলা চলে class in itself. নিজের অতীত স্মৃতিকে কেন্দ্র করে অবনীন্দ্রনাথ যে রহস্যের মায়াজাল বিস্তার করেছেন তা কোন চলিত মানদণ্ডের বিচারের অপেক্ষা রাখে না। একে রূপকথা বললে আপত্তি নেই, পটে আঁকা ছবি বললেও না বলা যাবে না, শুধু বস্তুর পটে না এঁকে এ ছবি আঁকা হয় মনের পটে। মাঝে মাঝে মনে হয় এ রচনা সম্পর্কে যে কোন বিশেষণই দিই না কেন, সব কথা বুঝি বলা হলো না।

আমাদের মনের চেতন লোকে যত জিনিষ জড়ো হয় তারই হিসাব-নিকাশ নিয়ে আমরা সৃষ্টি করতে বসি। চেতনা দিয়ে অনুভব করি সংসারকে, স্থির করি সিদ্ধান্ত, বিচার করি ভালমন্দ, প্রকাশ করি মন্তব্য। মনের অবচেতনে কত জিনিষ থেকে যায় ঘুমিয়ে, কত জিনিষ চেতনার স্পর্শমণির ছোঁওয়ার প্রতীক্ষাতেই থেকে গেল তার হিসেব কেই বা রাখে। জীবনের প্রত্যন্ত দেশে পৌঁছে জগতের স্মরণীয়তম ঘটনাগুলিকে মানুষ তার মনের ভাবনা দিয়ে ব্যাকুলতা দিয়ে লিখতে চায়, তার অন্তরের কোন্ গোপন তন্ত্রী সেই ঘটনার আঘাতে আঘাতে চঞ্চল হয়েছে তা প্রকাশ করতে তার আকুলতার অন্ত নেই। তাই তার চেতন মনের উপর যত তরঙ্গ উঠেছে মানুষ সেই তরঙ্গভঙ্গের ইতিহাস রেখে যেতে চায়। কিন্তু সমস্ত জীবন খুঁজে খুঁজে সুদীর্ঘকালের ব্যবধান পেরিয়ে কোন অস্পষ্ট ছায়ালোক থেকে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চেতনার প্রথম স্ফুলিঙ্গগুলিকে উদ্ধার করে এনেছেন। এগুলো বস্তুজগতের হিসাব-নিকাশে অবশ্যই বহুমূল্য নয়, কিন্তু শিল্পীর চেতনায় বহির্বিশ্বের তারাই হলো প্রথম আলোকপাত। তার আগে যা কিছু তা নিকষকালো

অচেতনার অন্তরালে ঢাকা পড়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর প্রথম পাঠের বিবরণ দিয়ে বলেছেন—"কেবল মনে পড়ে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' ..আমার জীবনে এইটিই আদি কবির প্রথম কবিতা ·· ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।" প্রথম চেতনার ঐ যে জাগরণ, শিল্পী বা স্রষ্টারা তাকে আর দশটা ঘটনার মতো একটি মনে করেন না। যে মন এত সুদীর্ঘ পথ চলে এতটা কাল কাটিয়ে দিল, কবে কোন সুদূরে তার যাত্রা হয়েছিল সুরু ? এ প্রশ্ন আর কারুর মনে থাক বা না থাক স্রষ্টার মনে থাকবে। তাই অন্য সব ঘটনার জঞ্জাল পেরিয়ে সেই শিশুকাল থেকে ভেসে এলো কয়েকটি অতি সাধারণ ঘটনা যারা এমন করে অসাধারণকে দেখবার দৃষ্টি খুলে দিলে শিল্পীর।

অবনীন্দ্রনাথ হচ্ছেন বাংলা শিশুসাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। তাই যারা শিশু, যাদের চেতনায় সদ্য সূর্যালোকের স্পর্শ লেগেছে তাদেরই জন্য লেখা। সেইজন্যেই জ্ঞানবৃদ্ধ-সমালোচনার ভয়ে পদে পদে তাঁকে নজর রাখতে হয় না, তাঁর গল্প ইঁটকাঠের বাস্তবের সঙ্গে মিলছে কিনা। তাঁর শ্রোতাদের মত তিনি নিজেও। রূপকথার শ্রোতারাই যে কেবল রস উপলব্ধি করে তা নয়, বক্তা নিজেও নিজের সেই ছোটবেলার টুকরো টুকরো ছবিগুলি দেখতে দেখতে ভাবমুগ্ধ হয়ে গেছেন। মন চলে গেছে সে কোন সুদূর লোকে, শিল্পী হয়ে উঠেছেন কবি সামনে বসেছে ছেলের দল, চলছে অবনীন্দ্রনাথের গল্প। পাঠকগোষ্ঠীকে চোখের সামনে রেখে তাদের মনের মত করে কথা বলে লেখক, যখন তার কাজ কোন বিশেষ কিছুর প্রচার বা ঘোষণা। কিন্তু যে পাঠকগোষ্ঠী বা শ্রোতার দল অবনীন্দ্রনাথের সামনে বসেছে এদের মনে যেহেতু মতলবের বীজ বপন হয়নি এখনও তাই তাদের মনের মত করে লেখাতেই তাঁর সৃষ্টির

সার্থকতা। তাই তিনি বলছেন—“যারা কেবল শুনতে চায় আপন কথা থেকে থেকে যারা কাছে এসে বলে ‘গল্প বলো’ সেই শিশু জগতের সত্যিকার রাজারাণী বাদশা-বেগম তাদেরই জন্য আমার লেখা এই পাতা কখানা।...আর ডান হাতের কুর্ণিশ রইলো তাদেরই জন্যে যারা বসে শোনে গল্প রাজা-বাদশার মতো, কিন্তু ছেঁড়ামাদুরে নয়তো মাটিতে বসে; আর গল্পের মাঝে মাঝে থেকে থেকে যারা বকশিশ দিয়ে চলে একটু হাসি কিংবা একটু কান্না; মানপত্রও নয়, সোনার পদকও নয়; হয় একটুখানি দীর্ঘশ্বাস, নয় একটুখানি ঘুমে ঢোলা চোখের চাহনি।” মন যাদের পদে পদে বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখা টেনে আঘাত খেয়ে খেয়ে মরে তাদের জন্য এ জীবনকথা নয়, এ জীবনকথা তাদের জন্য যারা এসে বলে ‘গল্প বলো।’ কিন্তু যারা ছাপবে ঐ বই যারা পড়বে বয়স্ক লোক, তাদের জন্য কী রইলো ?—“যারা কিনে নিতে চায় পয়সা দিয়ে আমার জীবনভরা সুখদুঃখের কাহিনী, এবং সেটা ছাপিয়ে নিজেরাও কিছু সংস্থান করে নিতে চায় তাদের আমি দূর থেকে নমস্কার দিচ্ছি।·· ছাপা হবে হয়তো বইখানা। একদিন কোন বেরসিক অল্প দামে কিনে নেবে আমার সারা জীবন খুঁজে খুঁজে পাওয়া যা কিছু সংগ্রহ। এইটে মনে পড়ে যখন তখন হাসি পায়। বলি এ কি হয় কখনো ? সব কথা কি কেউ জানতে পারে, না জানাতেই পারে কোনকালে ?.. অনেক ভুগে পাওয়া এ-সব কাহিনী, কিনতে গেলে ঠকতে হয় বেচতে গেলে ঠকতে হয়।”

সংসারে কি সুন্দর আর কি সুন্দর নয় সেটা বোঝবার কোন বাঁধা ধরা মানদণ্ড নেই। সব মানুষের কাছে একই জিনিষ ভাল লাগবে এ কখোনো হয় না। কারণ মনের কোন নির্দ্দিষ্ট চেহারা নেই যে, যে কোন মত-বাদের জামা পরালেই তাকে বেশ মানাবে। প্রাচীন কালের রাজারা

তাঁদের হুকুমের গুঁতোয় শিল্পীর তুলি আর লেখনীকে চালিয়েছেন বহুবার, তাতে লেখার চারুত্ব প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু বক্তব্যে প্রাণের সুর লাগেনি। কোন কোন দেশে ঠিক তেমনি করেই রাষ্ট্র ছাপ মেরে দিয়েছে কোনটা তাদের মধ্যে সৎসাহিত্য আর কোনটা নয়। মানুষের প্রকাশ-শীল মনের উপর এমনি করে গদা ঘুরিয়ে সুন্দর-অসুন্দরের যে মান স্থির হয়েছে তা কোন বুদ্ধিমান্ লোকের কাছে গ্রাহ্যই নয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনায় বলেছেন যে সংসারে যার রূপ দেখার চোখ নেই তার চোখে যতই জ্ঞানাঞ্জন শলাকা ঘষে দেওয়া হোক দৃষ্টি তার কোনদিনই খুলবে না যদি অন্তরে বোধ না জাগে। সংসারে লোকের চোখে ময়ূর সুন্দর কিন্তু কলবিঙ্ক বা কাক নয়—এই কথা বলবার লোকই বেশী, যার চোখে আপনা থেকেই কলবিঙ্কের রূপ ধরা পড়েনি তাকে তো হাজার বক্তৃতা দিয়েও বোঝানো যাবে না কলবিঙ্কের রূপ কোথায়! তাই যা দেখি আমাদেব জীবনে, যা অতি সাধারণ তাই শিল্পীর চোখে অসাধারণ। আমাদের জীবনে ঝড়ের অভাব নেই—মনেব স্মৃতিপটে অল্পবয়সে দেখা দু একটী ঝড়ের গর্জনের ছবি যে একটুও নেই তা নয় কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের জীবনেও সেই ঝড় এলো, এলো তার চেতনাকে জাগাতে। যে ছেলে তিনতলা থেকে নামেনি, ঝড়ে তাঁকে নামালে দোতলায়—নূতন এক জগতের সিংহদ্বার খুলে দিলে চোখের সামনে। আর সব মুছে গেল কিন্তু পককেশ অবনীন্দ্রনাথের মনে অতিসুদূরের স্মৃতিমঞ্জুষা থেকে ভেসে এলো ঐ নিয়মভাঙ্গা ঝড় যা তাঁকে নামিয়েছিল তেতলা থেকে দোতলায়। রূপকথার একটা ধর্ম হচ্ছে যে শিশুকে সে একথা ভুলিয়ে দেয় যে সে শিশু। শিশু তখন সেই রূপকথার রাজ্যের রাজপুত্র হয়ে দাঁড়ায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছেন যে শিশু রূপকথা ভালবাসে কারণ

"The child ..doth reap
One precious gain, that he forgets himself."

কিন্তু রূপকথার সত্যকার স্রষ্টাও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ভুলে বসেন। শুধু শিশুকে ভোলানো নয়, তিনি নিজেকেও ভোলান। অবনীন্দ্র-নাথের অতি বাল্যবয়সেও চমকপ্রদ স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে নিশ্চয়ই ঠাকুরবাড়ীতে, কিন্তু চেতনমনের সেই স্মৃতিগুলিকে শিল্পী যেন ইচ্ছে করেই ভুলেছেন। বেছে বেছে এনেছেন ঘটনাগুলি যার পুরস্কার ঘুমে ঢোলা চোখের চাহনি।

রূপকথার স্রষ্টা কিন্তু সচেতন ভাবেই জানতেন এই রূপকথা তাঁর শ্রোতাদের মনে কি রঙের ছাপ লাগিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'রাজার বাড়ী' কবিতার ছোট ছেলেটি তার মার কাছে বলছে—ছাদের পাশে যে তুলসীগাছের টব, তারই পাশে রাজবাড়ী তারই পাশে ঘুমন্ত রাজকন্যা, তারই পাশে নাপতে পাড়া। বাস্তব জগতের প্রতি কী গভীর অবজ্ঞা—রাজবাড়ী, রাজকন্যা, নাপতে পাড়া সবই পাশাপাশি! সমাজ তার ভ্রুকুটিকুটিল রীতিবদ্ধতা নিয়ে পালাবার পথ খোঁজে। অবনীন্দ্রনাথের শিশুচিত্তের উপরেও একদিন ঐ রূপকথার প্রভাব পড়েছিল, বোধহয় সেই প্রভাবেই শিল্পীর মনে জন্ম হলো 'রাজকাহিনী' 'বুড়ো আংলা' আর 'আপনকথা'র। তাই গরাদে আঁটা ছোট ছোট জানলা দিয়ে চোখে পড়লো "মানুষ, মুরগী, হাঁস, গাড়িঘোড়া, সহিস, কোচম্যান, ছিরু মেথর, নন্দ ফরাস, গোবিন্দ খোঁড়া, বুড়ো জমাদার, ভিস্তি মুটে, উড়ে বেহারা, গোমস্তা মুহুরী, চৌকিদার, ডাক পেয়াদা সবাইকে নিয়ে মস্ত একটা যাত্রা চলছে এই উত্তরের আঙ্গিনাটায়।" বাস্তবে যারা অকিঞ্চিৎকর তারাই শিশুচিত্তের রাজদরবার আলো করে বসেছে। রূপকথায় যে শুধু রাজপুত্র এসেছে তা নয়, প্রিন্স

দ্বারকানাথের প্রপৌত্রকে ঘিরে নিজেদের অজান্তে যারা রাজা-উজীর-আমীর-ওমরাহ হয়ে বসেছে তারা ওই মুরগী, হাঁস, নন্দ ফরাস, গোবিন্দ খোঁড়া আর উড়ে বেহারার দল। তাই বলছি শুধু শ্রোতা নয় স্রষ্টার মনেও নূতন জগৎ তৈরী হয়েছে যাতে সুদীর্ঘকাল পরে আর সব স্মৃতির মধ্যে ঐ চরিত্রগুলিই বড় হয়ে আছে।

শিশু অবনীন্দ্রনাথের স্বপ্নমুগ্ধ মন কেমন করে গড়ে উঠলো, সেই ইতিহাসটি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর লেখার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখার গুণে সেই ইতিহাস রূপকথা হয়ে গেছে। নিজের রূপকথা শোনার প্রসঙ্গে বলেছেন "সেই ঘরের এককোণে বসে রূপকথা বলে একটা দাসী দাসীটার চেয়ে তার রূপকথাটাকে বেশী মনে পড়ে। এই দাসীটা ছিল আমার ছোট বোনের। সে বলে তার দাসীর নাম ছিল মঞ্জরী।...আমি দেখি মঞ্জরীকে...বসে আছে একটা লাল চামড়ার তোরঙ্গ ঠেস দিয়ে দুই পা ছড়িয়ে। তোরঙ্গটার সকল গায়ে পিতলের পেরেক মালার মতো করে আঁটা। মঞ্জরী ঝিমোচ্ছে আর কথা বলছে ;—'এক ছিলো টুনটুনি—সে নিমগাছে বাসা না বেঁধে রাজবাড়ীর ছাতের আলসেতে থাকে আর রাজপুত্তুরের তোশক থেকে তুলো চুরি করে করে ছোট্ট একটি বাসা বাঁধে।" গল্পটা ঐটুকুই। ঐতেই শিশুচিত্ত আপন বিস্তারের পথ খুঁজে পেল। সেই বিস্তারের গল্পটি আরও সুন্দর, "ছাতে ওঠবার সিঁড়ি বলে একটা কিছু নেই তখনো আমার কাছে, অথচ টুনটুনির বাসার কাছটায়—একেবারে নীল আকাশের গায়ে, ছাতের কার্ণিসে উঠে গিয়ে বসি পা ঝুলিয়ে। এমনি দিনের বেলায় রূপকথার সিঁড়ি ধরে পাখির সঙ্গে পেতেম ছাতের উপরের দিকটা।....এমনি করে গল্প কথার মধ্য দিয়ে কতো কি দেখেছি তখন! যখন চোখও চলে না বেশীদূর, পাও হাঁটে না অনেকখানি, তখন কাণ ছিল

সহায়। সে এনে পৌছে দিত কাছে ছাত, হাতে এনে দিতো কমলা-ফুলির টিয়ে পাখি, চড়িয়ে দিত আগডুম বাগডুম ঘোড়ায়, লাটসাহেবের পালকিতে এবং নিয়ে যেতো মাসীপিসির বনের ধারের ঘরটাতে আর মামার বাড়ীর দুয়োরেও।"

কিন্তু এ তো শুধু খেয়ালী অবনীন্দ্রনাথের রূপকথার আসর জমানো গল্প নয়। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি এর ভিতর দিয়ে যেন রূপস্রষ্টা অবনীন্দ্রনাথ কথা বলছেন ; বলছেন কেমন করে তাঁর মনে ঐ আপনভোলা রূপ-কথার জগৎ মাঝে মাঝে হাতছানি দিয়ে যেতো, ভুলিয়ে দিতো সংসারের দেনাপাওনার হিসাব-বেহিসাবের গরমিল। নিজের অজান্তেই বোধ-হয় আত্মবিস্মৃত শিল্পী তাঁর ভিতরের রূপমহলের রঙে রসে বিচিত্র চিত্র-শালার কারখানার চাবিটি আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন।

তাই দেখতে পাই আর এক জায়গায় তিনি বলছেন কেমন করে এই আপন-কথার ছবিগুলি হঠাৎ তাঁর মনের দুয়ারে এসে আত্মপ্রকাশ দাবী করে বসে। জীবনের কোন ঘটনাই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে মনে পড়ছে না, পরপর বসে যাবেন বাছবিচার না করে তা তো শিল্পীর মনে হবার নয়। জীবনে যত ঘটনা ঘটে সব তো স্রষ্টার কাছে একমূল্যের দাবী নিয়ে আসে না। স্রষ্টার অন্তরে আর একটা পৃথিবী আছে, যেখানে বাইরের জগৎ শুধু ছায়া ফেলে না, নূতন করে জন্মও নেয়। স্রষ্টার কাছে, শিল্পীর কাছে সেই অন্তর্লোকের জগৎ বাইরের জগতের চেয়ে অনেক বেশী সত্য। সেইজন্যেই বাইরের জগৎকে স্রষ্টা নির্বিচারে গ্রহণ করেনি, কখনও করে না। সংসারের ঘটনার জঞ্জাল সরিয়ে সরিয়ে কখন যে কবি, শিল্পী হঠাৎ তাঁর মনের জিনিষটি খুঁজে পান তার হিসাব কেউ জানে না—অথচ মানুষের সকল সৃষ্টির সকল রহস্য সেই মনের মত জিনিষ খুঁজে পাওয়াতেই গোপন

হয়ে আছে। পথে যেতে যেতে কবি দেখেছিলেন রক্তকরবী ফুটে আছে থরে থরে—স্মৃষ্টির কারখানায় ভিতরে ভিতরে কাজ সুরু হয়ে গেল। কিন্তু যতদিন না কবি নিজে রক্তকরবীর ভূমিকায় লিখলেন যে এত বড় স্মৃষ্টির মূলে ঐ কটা আলোকদীপ্ত রক্তকরবীর প্রেরণা কাজ করেছে ততদিন এর সমস্ত রং গুটি নিছক তত্ত্বব্যাখ্যাতেই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ এই কথাটিকে নিজের মত করে বলেছেন—এ যেন সেই emotion recollected in tranquility—হঠাৎ মনের দরজায় এসে আঘাত করছে, আমি এসেছি, চটপট কলম নাও তুলি নাও, লিখে ফেলো, এঁকে ফেলো। তাঁর অনবদ্য ভাষাতে যদি পড়ি তাহলে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন হয়ে যাবে—“সেই ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত না-জানা থেকে জানার সীমাতে পৌছনোর বেলা একটা কোন নির্দিষ্ট ধারা ধরে অঙ্কের যোগ বিয়োগ ভাগফলটার মতো এসে গেল জগৎ সংসারের যা কিছু, তা তো হলে না আমার বেলায়। কিম্বা ঘটা করে থাকতে জানান দিয়ে ঘটলো ঘটনা সমস্ত তাও নয়। হঠাৎ এসে বললে তারা বিস্ময়ের পর বিস্ময় জাগিয়ে—‘আমি এসে গেছি।’ ঠিক যেমন ছবি এসে বলে আজও হঠাৎ—‘আমি এসে গেলাম, এঁকে নাও চটপট।’ যেমন লেখা বলে হয়ে গেছি দৌড় চালিয়ে চলো কলম।” এইভাবে চটপট মনের কারখানায় নূতন রূপ নিতে বাছা বাছা জিনিষ-গুলো যিনি পাঠাচ্ছেন তিনি অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘চমকি দেবী’। তিনি “হঠাৎ পড়া হঠাৎ না-পড়া দিয়ে” তাঁর শিক্ষা সুরু করে দিলেন। সেই ‘চমকি দেবী’ চকমকি ঠুকে যে জিনিসগুলো পাঠালেন সেই কবেকার ফেলে আসা ছেলেবেলার রুদ্ধদ্বার ভাণ্ডার থেকে সেইগুলো নিয়েই আপন কথার মালা গাঁথা হয়েছে।

‘আপন কথা’র অধ্যায়গুলি পরপর ভাগ করা হয়েছে নানা নামে

—মনের কথা, পদ্মদাসী, সাইক্লোন, উত্তরের ঘর, এ-আমল সে-আমল, এ-বাড়ি ও-বাড়ি, অসমাপিকা, বসতবাড়ী। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে এর সমালোচনা লেখার বুঝি কোন প্রয়োজন নেই। এ তো সমালোচনার অবকাশ দেয় না পাঠককে। যতবারই ভাবি একটা বিশেষ অধ্যায় পড়ে সমালোচনা করতে বসবো, ততবারই দেখি নিজের অজান্তে কখন সে অধ্যায় পার হয়ে আরও দুতিনটে অধ্যায় পিছনে চলে গেছি। মনে হয় কি আলোচনাই বা হবে, এ হলো এমন লোকের কথা যার চোখে অফুরন্ত রঙের স্রোত ধরা পড়েছে, যার কাছে সংসারের তুচ্ছতম শব্দগুলিও পূর্ণপ্রাণ ছবি ফুটিয়ে তোলে, পাঠকের কল্পনাকে যে অবাধ মুক্তি দেয়।

এ-বাড়ি ও-বাড়ি অধ্যায়ে দেখি শব্দ শুনেও ছবি গড়ে তুলতেন শিশু অবনীন্দ্রনাথ। ভোর যখন চারটে, ঘুম যখন সবে ভাঙ্গলো, কিন্তু তখনো ফোটেনি আলো পূর্ব-দিগন্তে, শিশু অবনীন্দ্রনাথ শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছেন ঘোড়ার গা ডলছে সহিস। নানা রকম শব্দ সৃষ্টি হয়ে চলেছে, মনে মনে সেই শব্দগুলোকে নানা রকম কথায় তর্জমা করে দেওয়া হচ্ছে, পরিষ্কার একটা ছবি—সহিস ডলছে ঘোড়া—ভেসে উঠেছে মনের পটে। "কতকগুলো শব্দ দিয়ে ঘটনাটা দেখতে পাচ্ছি। অন্ধ ভিখারী পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে গান গেয়ে, চোখের আড়ালে সে, কিন্তু তার 'গানটা ধরে আসতো সে একেবারে তিনতলায় উঠে।" সন্ধ্যে বেলায় খিড়কির দুয়ারে হাঁকতো 'মুশকিল-আসান' কথাটার উল্টো অর্থটাই শিশুমনে প্রবল হয়ে উঠতো। দুপুরবেলা 'চুড়ি চাই, খেলনা চাই'—এমনি করে আরও কত শব্দ আসতো বরফওয়ালার, ফুলমালির—শুধু রূপের জগৎ নয়, একটা শ্রুতির জগৎও তৈরী হয়েছিল যার মধ্যে শ্রুতির সূত্র ধরেই ভেসে আসতো নানা ছবি। কাণ আর মন পরস্পরে মিলে

ঐ জগৎ তৈরী করতো। এমনি করে চোখ কাণ খুলে সারা জীবন অবনীন্দ্রনাথ বাইরের জগৎকে অন্তরে টেনে নিয়েছেন। যে শিল্পী পরবর্তী কালে ছাত্রদের বলেছেন চোখ বুজে ধ্যান করে নয়, চোখ খুলে প্রাণভরে দেখে আঁকো, তিনি যে সংসারের সব রূপরস গভীর আগ্রহে নিজের মধ্যে টেনে নেবেন তাতে আশ্চর্য্য কিছু নেই। সমস্ত 'আপন কথা'য় সেই লোকটিকেই পাওয়া যাবে মনে যার কোন বাধন কাজ করেনি। সমস্ত জীবন যার ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে অরূপের সন্ধানে, রূপের আলোকধারায় বিকশিত হয়ে সেই শিল্পীর জীবনকথা এই বই।

কিন্তু এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে কল্পনার সুরবিন্যাসই এই গ্রন্থের শেষ কথা। নানাভাবে জীবন ধরা দিয়েছে, ধরা দিয়েছে সেকাল, ধরা দিয়েছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী, কিন্তু সব ধরা দিয়েছে একটা সুদূর কালের ঘোমটা পরানো রহস্যের মায়াজালের মধ্য দিয়ে। কিন্তু বাড়ীর লোকেদের চেয়ে অনেক বেশী জায়গা জুড়েছে চাকর-বাকরেরা, দাসদাসীরা, সহিস কোচম্যানেরা। তাদের নিয়েই ছবি আঁকা, তাদের রূপের মধ্য দিয়েই নিজের বাল্যচেতনার অনুভব। এই সব নিম্নতলবাসীরা শিল্পীর পূর্বদিনের কল্পনার সঙ্গী। এদের মধ্যে যত ছবি তিনি ফুটিয়েছেন তার মধ্যে বোধহয় গোবিন্দ খোঁড়া, ভিস্তি, সমশের কোচম্যানই অপূর্ব। অন্য কোথাও তো দূরের কথা অবনীন্দ্র-নাথের রচনাতেও এদের জুড়ি নেই। চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথ জীবনটাকে আগাগোড়াই ছবির মধ্য দিয়ে এঁকেছেন। সে ছবিতে চমকদারী ভাষার রঙ ফলানোর দরকার হয়নি, সহজ ভাষার সহজ টানে দেখবার গুণেই তা ছবি হয়ে উঠেছে। গোবিন্দ খোঁড়া শুধু রূপকথার টাইপই নয় সে আমাদের জীবনের একটি বিশিষ্ট টাইপও বটে।

"গোবিন্দ খোঁড়া রাজেন্দ্রমল্লিকের ওখানে রোজই ভাত খায় আর আমাদের গোল চক্করটাতে হাওয়া খেতে আসে। কতোকালের পুরানো আঁকাবাঁকা গাছের ডালের মতো শক্ত তার চেহারা, ঠিক যেন বাইবেল কি আরব্য-উপন্যাসের একটা ছবির থেকে নেমে এসেছে। গোল-বাজারের ফটকের একটা পিল্‌পে ছিল তার পিঠের ঠেস। বৈকালে সেখানটাতে কারো বসবার জো ছিল না। বাদশার মতো গোবিন্দ খোঁড়া তার সিংহাসনে খোঁড়া পা ছড়িয়ে বসে যেতো। পাহারাওয়ালা, কাবুলিওয়ালা, জমাদার, সরকার, চাকর, দাসী সবার সঙ্গেই আলাপ চলে খাতিরও সকলের কাছেই যথেষ্ট তার। শহর ঘোরা সে যেন একটা চলতি খবরের কাগজ কিংবা কলকাতা গেজেট। পাঁচিলের উপর বসে সে খবর বিলোতো। শুনেছি প্রথমবার প্রিন্স আসবার সময় পুলিশ থেকে তেল বিলিয়ে গরীবদের ঘরেও দেওয়ালী দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গোবিন্দর ঘর দুয়োর কিছুই নেই—সে ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে গোছের মানুষ, এটা পাহারওয়ালারা সবাই জানতো। তারা গোবিন্দকে ধরে বসলো পিদুম জ্বালাতেই হবে - ঘর না থাকে ঘর ভাড়া করেও পিদুম জ্বালানো চাই। গোবিন্দ তখন আমাদের গোলচক্করের দরবারে বসেছে; পুলিশের রহস্যটা বুঝেও যেন সে বোঝেনি এইভাবে পাহারওলাকে শুধুলে 'সরকার থেকে কতটা তেল গরীবদের দেওয়ানোর হুকুম হলো?' একপলা করে তেল যেমন পুলিশম্যান গোবিন্দকে বলা, অমনি জবাব সঙ্গে সঙ্গে 'যাঃ যাঃ তোর বড়োসাহেবকে বলিস, গোবিন্দ এক সের তেল নিজে থেকে খরচা করছে'।"

এমনি ছবির প্রদর্শনী বসে গেছে বইটার পাতায় পাতায়—এমনই জীবন্ত এই ছবিগুলো যে পাঠকের মনেও সঙ্গে সঙ্গে ছবি ভেসে উঠছে।

পাঠকের কল্পনার প্রদীপ জ্বলে উঠছে শিল্পীর কল্পনার ছোঁওয়া লেগে। শিল্পী তো সেই যার ছবি শুধু ছবি হয়ে দোলেনা চোখের সামনে, মনের গভীরে কল্পনার দোলনাও দুলিয়ে দিয়ে যায়। অবনীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে আর একটি চরিত্র বাংলা সাহিত্যে চিরকালের মত রয়ে গেল, শুধু রয়েই গেল না, সে আপনার মধ্যে খুঁজে পেলো তার কাজের গৌরব তার জীবনের সর্বজনঘৃণ্যতার অপমানকে তুচ্ছ করে। সে হচ্ছে ছিরু ডোম, যার দুহাতের ঝাঁটায় সমস্ত রাস্তায় ঢেউ খেলানো দু প্রস্থ রেখায় চমৎকার নক্সা টানা হয়ে যেতো। চিরকাল যে ডোম, ঝাঁট দিয়ে ময়লা সাফ যার কাজ, সে ছিলো—"রাস্তার আর্টিষ্ট ধূলোর আর্টিষ্ট ডবল ঝাঁটার আর্টিষ্ট – তার কাজ দেখে চোখ ভুলে থাকতো কতক্ষণ।" সমস্ত জীবনের যিনি আর্টিষ্ট, কোন তুচ্ছ যাঁর দৃষ্টিকে ঢেকে রাখনি, তাঁর কাছেই ধরা পড়লো ছিরু ডোম শুধু ডোম নয়, সে আর্টিষ্ট, তার ঝাঁটাগুলোর সঙ্গে নিজের তুলির তুলনা দিয়েছেন গভীর উৎসাহে। অন্তরে যে গভীর দরদ ছিল ঐ সব বেহারা, সহিস আর ডোমেদের জন্য সেটা কোথাও বক্তৃতা দিয়ে জাহির করার কথা মনেও হয়না কারণ সে দরদ ছিল স্বচ্ছ, সহজ এবং [illegible] সত্য।

সব শেষে যে অধ্যায়টি এলো তা হলো বসতবাটী। প্রিন্স দ্বারকানাথ তাঁর বাইরের বাড়ী হিসাবে এই বাড়িটি তৈরী করেন। সেই বাড়ী অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ গিরীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে। একদা এই বাড়ীতে বাংলাদেশের শিল্পসাধনার নতুন যুগের সূত্রপাত করলেন গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। দেশ বিদেশ থেকে লোক এসেছে নবভারতের শিল্পসাধনার ঐ তীর্থকেন্দ্রে। কি প্রচণ্ড প্রাণের স্রোত ঐ বাড়ী থেকে প্রবাহিত হয়েছে সারা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে। বাড়ীটা ছিল অবনীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়। এ বাড়ী সম্বন্ধে তাঁর আশঙ্কা ছিল,

পরবর্তীকালে প্রমাণ হলো যে সে আশঙ্কা অমূলক নয়। তিনি বলেছিলেন :—

"আমি বেঁচে আছি পুরানোর সঙ্গে নতুন হতে হতে ; তেমনি বেঁচে আছে এই তিনতলা বাড়ীটাও আজ যার মধ্যে বাসা নিয়ে বসে আছি আমি। আজ যদি কোন মাড়োয়ারী দোকানদার পয়সার জোরে দখল করে এ বাড়ীটা তবে এ বাড়ীর এ-কাল সে-কাল দুই-ই লোপ পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই। যে আসবে তার সেকাল নয় শুধু একালটাই নিয়ে সে বসবে এখানে। দক্ষিণের বাগান ফুঁয়ে উড়িয়ে ওখানে বসাবে বাজার, জুতোর দোকান, ঘি ময়দার আড়ং ও নানা— যাকে বলে প্রফিটেবল কারখানা তাই বসিয়ে দেবে এখানে। সেকাল তখন স্মৃতিতেও থাকবে না।"

সমস্ত বইটা জুড়ে দেখতে পাই জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি কি গভীর ভালবাসা। তাই নিজের কথা যেটুকু বলেছেন সে ঐ ভালবাসা জানানোর জন্যই। আজকাল সাহিত্যে ভালবাসা বা দরদ জানাতে হলে উচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতার অবতারণা চাই। ভালবাসি এই কথাটা বেশ কয়েকবার চেঁচিয়ে বলা চাই তবেই যেন তৃপ্তি। কিন্তু অন্তর যাঁর কানায় কানায় ভরেছে, যিনি দুচোখ মেলে দেখে গেলেন অপরূপকে, মানুষকে দেখলেন নানাভাবে, তাঁর ভালবাসায় যেমন উচ্ছ্বাস আছে তেমনি আছে শিল্পীজনোচিত প্রশান্তি। সে ভালবাসা তো বাইরের তরঙ্গোচ্ছ্বাস নয়, সে তাঁর গভীর প্রাণের আত্ম-উপলব্ধি।

একটা আশ্চর্য বেদনায় মন ভরে ওঠে। সে বাড়ী নেই, সেই ভালবাসার অমৃতউৎস নেই, নেই সেকালের দিনগুলো। তাঁর 'আপন কথা, তাঁর স্নেহপ্রবণ অন্তরের স্বরূপটিকে প্রকাশ করে। নিছক গল্প

এগুলো, নেহাৎই গল্প লেখার ঢং তবু দুচোখ ভরে জল আসে, সমালোচনার সব রীতি ভেসে যায়, নিজেকে প্রশ্ন করি দুচোখ দিয়ে কি এমন করে কখনো পৃথিবীকে দেখতে পাবো? সুর কি কখনো এমনি করে বাজবে কানে? এমন করে কি কোনদিন জীবনকে ভালবাসতে পারবো?

আত্মকথা—প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরীর 'আত্ম কথা' তার শিশুজীবন থেকে বিলাত যাওয়ার আগেকার অবস্থা পর্যন্ত লেখা। আত্মচরিত হিসাবে এ বইয়ের যে বিশেষ মূল্য আছে তা মনে হয় না। কারণ স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে লেখক অত্যন্ত অন্যমনস্কতার সঙ্গে তাঁর এই আত্মকথা লিখেছেন— না বলেছেন নিজের কথা, না বলেছেন সমাজের কথা, না বলেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠদের কথা। প্রত্যেকটি ছবিই দুচার লাইনে শেষ হয়ে গেছে। লিখতে সুরু করার সময় থেকেই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কালীপ্রসাদের মৃত্যু, লেখকের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু, শাশুড়ী জ্ঞানদানন্দিনীর মৃত্যু, কিছুকাল আগে শ্যালক সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু তাঁর মনকে ক্রমাগতই বিচলিত করতে থাকে। ঠিক সেই সময়েই জাপানী বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে। বিক্ষিপ্ত এই মানসিক অবস্থায় তাঁর 'আত্মকথা' কয়েকটি খণ্ড খণ্ড হঠাৎ ভেসে যাওয়া চিত্রের যোজনা মাত্র।

এ আত্মকথার তুলনা হচ্ছে মাইকেলের সনেট। প্যারিসের জীবন-সংগ্রামে বিপর্যস্ত মধুসূদন বড় কাব্য রচনার মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন, তাই ছোট ছোট ক্ষণিক ভাবনার তরঙ্গগুলিকে বেঁধে রেখেছেন সনেটের মধ্যে। ছোট ছোট ভাব—অতীতের সংস্কৃতি আর স্মৃতি থেকে পাওয়া। সেই জয়দেব, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, সেই কপোতাক্ষী, সেই বিদ্যাসাগর। প্রমথ চৌধুরীরও তাই; স্থৈর্য নেই মনে, আত্মসমাহিত হয়ে আত্মকথা লিখবেন পারিপার্শ্বিক অবস্থা তেমন

নয়। অথচ টুকরো টুকরো ছবি ভেসে ওঠে মনের পটে, বন্ধুজন জীবনকথা শুনতে চায়, তাই সেই ছবিগুলির যতটা পারা যায় ধরে রাখেন। কিন্তু তাতেও যেন খুব মন নেই। যে প্রসঙ্গ সম্বন্ধে পাঠক উৎসাহিত হয়ে ওঠে, ঠিক যেখানে রস জমছে হঠাৎ সেখানেই লেখক থামলেন, চলে গেলেন প্রসঙ্গান্তরে।

ভূমিকায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথা লেখা আছে যার থেকে তাঁর এই সময়কার মনের কথা জানা যাবে :—"আমার জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যার উল্লেখ করলে পাঠকদের কাছে অসাধারণ বলে মনে হবে। * * * আত্মকথা লিখতে আরম্ভ করি অতি দুঃসময়ে। রবীন্দ্রনাথ তখন একটা কঠিন রোগে আক্রান্ত। পরে তিনি সে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলেন। তারপরে ১৯৪১ সালে উপর্যুপরি আমার নানারকম দুর্ঘটনা ঘটতে লাগলো। প্রথমতঃ উক্ত সালের জুন মাসে আমার প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র কালীপ্রসাদ বিমানযুদ্ধে মারা যায়। তারপর ৭ই আগষ্ট আমার জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তার কিছুদিন পরে ২রা অক্টোবর তারিখে আমার শাশুড়ী ৺জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, যাঁর আশ্রয়ে বাস করতুম, তিনি ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান। তার বছরখানেক পূর্বে তাঁর একমাত্র পুত্র এবং আমার শ্যালক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপ্রত্যাশিতরূপে যন্ত্রণাদায়ক রোগভোগের পর মারা যান * * * কিছুকাল পরে আমি কলকাতা ত্যাগ করে পৌষমেলার অব্যবহিত পূর্বে সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে চলে আসি জাপানী আক্রমণের ভয়ে।"

কিন্তু এই অবস্থাতেও তাঁর মনের স্বাভাবিক দীপ্তি, গভীর মননশীলতা একটুও কমেনি। অল্প কয়েকটি রেখায় যেমন পূর্ণাঙ্গ ছবি না হলেও পূর্ণতার আভাস থাকে তেমনি সুদীর্ঘ আত্মপ্রকাশ না থাকলেও

ছোট ছোট কথার চমকে যে সব ছবি তিনি ফুটিয়েছেন তার মধ্যে একটা চমৎকার মেজাজ আছে। প্রমথ চৌধুরীর সচেতন পাঠকেরা নিশ্চয়ই জানেন যে ঐ মেজাজটাই হলো তাঁর নিজস্ব, ঐ মেজাজটা থাকলেই প্রমথ চৌধুরীকে পাওয়া গেল, তা সে যত অল্প আয়তনেই হোক।

অতুল গুপ্ত মহাশয় 'আত্মকথা'র ভূমিকায় লিখেছেন যে, বাংলার শিক্ষিত সমাজ যে প্রমথ চৌধুরীকে জানে, যিনি আধুনিক গল্পের প্রবর্তক, যিনি 'সবুজপত্রে'র সম্পাদক আর লেখক, 'আত্মকথা' তাঁর মন ও ভাষার ভিত্তি গড়নের ইতিহাস। কথাটা খানিকটা সত্যের আভাস বহন করে কিন্তু পূর্ণ সত্য নয়। যে শিথিল গদ্য বিন্যাসের ধারা অনুসরণ করে 'আত্মকথা' চলেছে তার মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর মানসিক গঠনের পূর্ণ ইতিহাস নেই, ভাষা-গঠনের ইতিহাস তবু খানিকটা আছে, কিন্তু তাও ইঙ্গিতের ছদ্মবেশে গোপন হয়ে আছে, পরিস্ফুট নয়। যে প্রমথ চৌধুরী তাঁর তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার ভাষার ভিত্তিতে শাণিত করে তুললেন বাংলা ভাষাকে, যে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' বাংলাভাষার চলার গতিতে চমক লাগালো, যাঁর রসিক চিত্তের গভীর বৈদগ্ধ্য গল্প ও প্রবন্ধ সাহিত্যে নূতন আনন্দ সঞ্চার করলো সেই প্রমথ চৌধুরীর মন ও ভাষা গঠনের ইতিহাস 'আত্মকথা' এ কথা বলা নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে।

কিন্তু অতুলবাবুর বক্তব্যের সেই অংশটুকু নিয়ে কেউই তর্ক তুলবেন না যেখানে তিনি বলেছেন "এ আত্মকাহিনীতে যে সব ঘটনা ও লোকের বর্ণনা আছে তা এমন নিপুণ রেখায় আঁকা, এমন কৌতুক হাস্যে সমুজ্জ্বল যে নিজগুণেই তা সাহিত্য হয়ে উঠেছে। × × যাঁর সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয় তার শরীর ও মনের চেহারা ও ভাবভঙ্গী তাঁর

মনে এঁকে যায়। আর মনে করলেই তার শব্দচিত্র অসাধারণ কৌশলে লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন। এর পরিচয় তাঁর ছোট গল্পে ছড়ানো রয়েছে। এই আত্মকথা সাহিত্য হিসেবে তাঁর ছোট গল্পের মতোই তীক্ষ্ণ ও রসাল।" একথা এত স্পষ্ট যে পাঠক দুপাতা ওল্টালেই বুঝতে পারবেন যে সেই 'চার ইয়ারী কথা'র বীরবলই এই আত্মকথার মধ্য দিয়ে কথা বলছেন, কেবল বার্ধক্য আর সাংসারিক দুর্ঘটনায় তাঁর সেই মানসিক স্থৈর্যটুকু ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে।

প্রথমেই আছে যশোরের কথা, তাঁর জীবন যেখান থেকে যাত্রা সুরু করেছিল। বিশেষ কিছুই মনে নেই; মনে আছে সেই বাড়ীটি যেখানে তারা থাকতেন। আর মনে আছে শহরে একদিন আগুন লেগেছিল। অল্প কয়েকটি জিনিস মনে ছাপ রেখে গেছে আর সব তলিয়ে গিয়ে যশোর ত্যাগ করে আসার কথা মনে পড়ছে। শিশু-চিত্তের মনের পর্দায় স্মৃতির মঞ্জুষা থেকে বিশেষ কোন ছবিই আসে না। তিনি লিখেছেন "শিশুর যা ঘটে তা ঘটনাই নয়। একটা অসাধারণ নড়াচড়ার কথা ছোট ছেলেদের তাই মনে থাকে।" এই 'অসাধারণ নড়াচড়া', বস্তুটা যে কি তা সব চেয়ে ভাল করে দেখিয়েছেন অবনীন্দ্র-নাথ তাঁর 'আপন কথা'য়। শিশুকালের দিনগুলি থেকে পদ্মদাসী আর নাইক্লোন কতকালের ব্যবধান পেরিয়ে অস্পষ্ট কুয়াসার ধোঁয়া কাটিয়ে বহুদিনকার ঘসে যাওয়া একটা পুরানো ফটোগ্রাফের মতো মনে পড়ে—কত কাল পার হয়ে গেছে, অবনীন্দ্রনাথ তাদের ভুলতে পারেননি, তারা ঐ 'অসাধারণ নড়াচড়ার' ব্যাপার।

কিন্তু যশোরের স্মৃতির একটু বাকী রয়ে গেল। মেয়ে স্কুলে পড়তে পড়তে ভাল লেগেছিল একটি মেয়েকে। ঐ গল্পটি বলতে গিয়ে লেখক রসিকতাও যেমন করেছেন তেমনি একটু ক্ষোভের স্পর্শও রয়ে গেছে।

—"আমি একটি বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলুম। একটি বালিকাকে আজও মনে আছে। মেয়েটি ছিল শান্তশিষ্ট আর তার ছিল কপাল জোড়া দুটি চোখ, ঠিক খাঁদা নয় আর বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। পাঁচ বৎসর বয়সে যদি কেউ love-য়ে পড়ে তা হলে আমি তার সঙ্গে love-য়ে পড়েছিলুম। অনেকদিন পর্যন্ত আমার মনে হত মেয়েটির কি হলো কার সঙ্গে বিয়ে হলো।"

তারপর সুরু হলো কৃষ্ণনগরের কথা। এই অংশটির মধ্যে আধুনিক গদ্যসাহিত্যের প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরীর ভাষা-গঠনের ইতিহাস কিছু কিছু আছে। কৃষ্ণনগরই প্রথম তাঁর চেতনাকে জাগ্রত করলো। কোন লেখকের উপর কোন বিশেষ স্থানের প্রভাব কত বেশী হতে পারে তারই সুনিশ্চিত সাক্ষ্য আছে ঐ কৃষ্ণনগর অধ্যায়ে। তাঁর বাল্যশিক্ষা থেকে সুরু করে অনেক বছর কাটলো কৃষ্ণনগরে। লিখছেন "কৃষ্ণ-নগরে এসে হঠাৎ আমি জেগে উঠলুম—অর্থাৎ আমি চেতন পদার্থ হলুম এ জগৎ যে বিচিত্র সে জ্ঞান আমার জন্মাল।" নিজের শিক্ষালাভ প্রসঙ্গের একটি সমস্যা উল্লেখ করে বলেছেন যে জীবনে যেসব সমস্যার সঙ্গে সচেতন ভাবে জড়িত হয়েছেন কেবল সেগুলির বিবৃতিই দিয়ে যাবেন। অর্থাৎ সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাতেও যে সমস্ত ঘটনা ঢাকা পড়ে যায়নি সেগুলিরই উল্লেখ আছে। প্রমথ চৌধুরী যে স্বভাবতঃই হাস্যরসিক ছিলেন তা তাঁর ঐ ঘটনাগুলির উল্লেখ দেখলেই বোঝা যাবে। বেছে বেছে সেই সব ঘটনার ফুল দিয়ে জীবনের মালা গেঁথেছেন যেসব ফুল পরিহাসের শিশির-কণায় নিয়তই ঝলমল করছে। পরপর স্কুলে ভর্তি হওয়া আর স্কুল ছেড়ে যাওয়ার যে সব ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছিল তা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি হাস্যকর। কৃষ্ণনগরের কোন স্কুলই বাদ ছিল না—এই সব

স্কুলের বর্ণনায় দু একটি শিক্ষক সম্বন্ধে অতীতের স্মৃতিমঞ্জুষা থেকে কিছু কিছু সংগ্রহ করে আনলেও লেখক যেন ঐ স্কুল বদলের রসিকতাটুকু দিয়েই শেষ করেছেন এ প্রসঙ্গ। কোন ছবিটিই পূর্ণ নয়—এ যেন আত্মভোলা শিল্পীর দু একটা ছবির টান, তাতে যদি ছবি ফুটলো তো ফুটলো না যদি ফোটে তো নাই ফুটুক।

বস্তুতঃ বাংলা গদ্যে যদি আত্মভোলা শিল্পী কেউ থেকে থাকেন তিনি হলেন প্রমথ চৌধুরী। তাঁর গল্প, তাঁর প্রবন্ধ সব কিছুই একটা অন্য-মনস্কতার ভঙ্গী নিয়ে তিনি লিখে গেছেন। তাঁর লেখা যেন তাঁর হয়েও তাঁর নয়। বুদ্ধির দীপ্তিতে রচনা ক্ষুরধার, স্বচ্ছ পরিষ্কার ধারণা প্রামাণ্য বস্তুকে কেন্দ্র করে দুর্ভেদ্য যুক্তিজাল বিস্তার করেছে, তবু গল্প-লেখকের পরিণতি লাভের তাড়া নেই তাঁর, প্রবন্ধকারের সুক্তি সবস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ব্যস্ততা নেই। প্রবন্ধ গল্প সবই তাঁর খেয়ালের রাজ-পথ দিয়ে চলেছে—তাই যতক্ষণ খেয়ালী মেজাজ চলেছে ততক্ষণই চলে-ছেন তারপর থেমে গেছেন চুপচাপ—থেমে যাওয়ার ভঙ্গী দেখলেই বোঝা যায় যে আবার নিজে থেকে না চল্‌লে একে আর নড়ানো যাবে না।

ঐ 'কৃষ্ণনগর' পর্যায়েই লেখক তাঁর ভাষা শিক্ষার ইতিহাসের গোড়াটুকু বিবৃত করেছেন। কৃষ্ণনগরে মালোপাড়ার যারা মাছ ধরে, নৌকা বায় তাদের কাছ থেকে তিনি লৌকিক শব্দ সম্ভার আহরণ করেছিলেন। তখনকার কৃষ্ণনগর-শান্তিপুরের ভাষাই ছিল সবচেয়ে শ্রুতিমধুর। সেখানকার সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষাই পরবর্তী কালের 'সবুজপত্র' সম্পাদক বাংলা চলিত গদ্যের নেতা প্রমথ চৌধুরী ও বীরবলকে ভাষা যুগিয়েছিল। ভাষা ছাড়া ঐ সময়েই তাঁর গান শোনার কান আর ছবি দেখা বা স্থাপত্য দেখার চোখ খুললো। কিন্তু সন্ধানী পাঠক বার বার ঐ একই দুঃখ প্রকাশ করবে- যে কেবল ঐ

টুকুই—সাধুভাষার অচলায়তন ভেঙ্গে যে চলতি ভাষা রবীন্দ্রলেখনীর প্রসাদও পেলো সেই চলতি ভাষার প্রথম শিল্পী প্রমথ চৌধুরীর ভাষা গঠনের ইতিহাসশুধু এইটুকু! লেখক বলেছেন "আমার ভাষার বনেদ হচ্ছে সেকালের কৃষ্ণনাগরিক ভাষা.........আমি জন্মেছিলুম পদ্মাপারের বাঙ্গাল, কিন্তু আমার মুখে ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর। সেই ভাষাই আমার পুঁজি তারপর তা সুদে বেড়ে গিয়েছে।" এই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন যে কৃষ্ণনগরের ভাষার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বইও পড়েছিলেন। কৃষ্ণনগরী ভাষার বড় গুণ তার স্থিতিস্থাপকতা। বিবেকানন্দ বলেছেন চলিত ভাষা হলো খাঁটি ইস্পাত, পাথরে কাটলে দাঁত বসে না কিন্তু আবার ইচ্ছামত যেদিকে খুসী বেঁকানো যেতে পারে—সেই হলো ভাষার স্থিতিস্থাপকতা। প্রমথ চৌধুরী একথা জানতেন তাই বলেছেন—"আমার লেখার মধ্যে যদি বাকচাতুরী থাকে ত তার জন্য আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী ..... দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির মোড়কে মেকি পেট্রিয়টিজম, ঝুটো ধর্ম ও নানাপ্রকার সামাজিক মিথ্যাচারের উপর তাঁর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করেছেন। বীরবলও তেমনি লোকের অন্তরে মিছরীর ছুরি ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন।"

কৃষ্ণনগরের ভাষার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে বঙ্কিম, দীনবন্ধু, নবীন সেন, রঙ্গলাল ইত্যাদি। এ ছাড়াও কালীপ্রসন্নের মহাভারত আর নানা দেশের রূপকথাও পড়ার অভ্যাস ছিল। ফরাসী সাহিত্য কিছু কিছু আয়ত্ত ছিল, ইংরাজী বড় লাইব্রেরীও ছিল বাড়ীতে। সব মিলিয়ে যেটা হলো সেটা পরবর্তীকালের কৃতকার্যতার স্বল্পতম পূর্বাভাসের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। তার একমাত্র কারণ আগেই বলেছি, লেখার মন নেই খেয়ালের রথ থেমেছে। এ যেন বন্ধুজনের অনুরোধ এড়াতে না পেরে অনিচ্ছুক গায়কের দুলাইন গেয়ে থেমে যাওয়া গান।

তারপর কৃষ্ণনগরের যে পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যেও দু একটি রসিক ইঙ্গিত, প্রকাশভঙ্গীর ক্ষণিক চমৎকারিত্ব ছাড়া বিশেষ কিছু নেই।

তারপর নানা ঘটনার নদী নালা পেরিয়ে প্রমথচৌধুরী হাজির হলেন কলকাতায়। ইতিমধ্যে যা ঘটলো তা যে কোন লোকের জীবনে ঘটতে পারতো। কিন্তু যখন কলকাতার কথা লিখেছেন তখন বারবার বলেছেন—"এই শহরে অর্জিত অভিজ্ঞতার কথা বলবার জন্য লিখতে বসেছি। কিন্তু আজকের দিনে কলকাতার ভগ্নদশায় সে বিষয়ে কিছু বলতে মন সরছে না * * * শুনছি জাপানীরা নাকি আমাদের মাথায় বোমা বর্ষণ করবে। ফলে বিজলীবাতি উদ্ভাসিত কলকাতা থেকে বহুলোক পলায়ন করেছে, আমি তাদের মধ্যে একজন। কলকাতার এই কৃষ্ণপক্ষ কেটে না গেলে ভারতবর্ষের রাজধানীতে হয়ত ফিরবো না। এ অবস্থায় লিখতে কি মন সরে?"

কলকাতার ছবিগুলি কিন্তু কৃষ্ণনগরের ছবির চেয়ে অনেক জীবন্ত। বোধহয় আরও পরিণত বয়সের ছবি বলে। হেয়ার স্কুল, বিভিন্ন শিক্ষক, বন্ধুর দল—উল্লেখ করেছেন কিছু কিছু। এই সময়ের মধ্যেই যে কি রকম কলকাতাই মেজাজ তৈরী হয়েছিল তার একটা উদাহরণ আছে পণ্ডিতের সঙ্গে কথোপকথনে। "পণ্ডিত মশায় অপর ফুটপাতে কোথায় যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি রাস্তা পার হয়ে আমাদের ফুটপাতে এলেন। এসে প্রথমেই বললেন, "কি হে চৌধুরী খুব বাবু সেজে বেরিয়েছ যে।"

আমি বল্লুম "হয়ত তাই।"

—পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়েছে, তা বোধহয় জান?

—হাঁ পণ্ডিতমশায় জানি।

—পাশ না ফেল ?

—পাশ

—তুমি পাশ !

—হাঁ ফার্ষ্ট ডিভিসনে।

তিনি আর দ্বিরুক্তি না করে অপর ফুটপাতে চলে গেলেন।"

এই সময় তিনি প্রথম পড়লেন রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়'—বলাবাহুল্য হেয়ার স্কুলের ছাত্র প্রমথ চৌধুরী 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে মুগ্ধ হননি। রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে ঐ 'ভগ্নহৃদয়' মারফৎ তাঁর প্রথম পরিচয়—সাহিত্য রসিক পাঠকেরা এই সংবাদটি পেয়ে খুসীই হবেন। কারণ যে প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রগদ্যকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন, যে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর গুরুস্থানীয় ছিলেন তাঁদের প্রথম মিলনের ঘটনাটি জানবার ঔৎসুক্য সকলেরই আছে। পরবর্তী অংশে দেখবো প্রথম দেখাও বর্ণিত হয়েছে।

বন্ধু-বান্ধব অনেক হলো পরবর্তী জীবনে যাঁরা বাংলাদেশের ইতি-হাসে ছাপ রেখে গেছেন। 'আত্মকথা'র এই অংশ পাঠকমাত্রেরই ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলবে এবং কলকাতার জীবনের দু একটা রমণীয় ছবিও উপভোগ করার আনন্দ পাঠকমাত্রেই পাবেন। এই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, লালচাঁদ বড়াল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হলো। এই সব উত্তর-কৃতী লোকেদের সঙ্গে পরিচয় এবং কলকাতা বাস তাঁর জীবনে ছাপ রেখে যায়। তাই বলেছেন, "কলকাতা বাসের ফলে আমার এ সহরের প্রতি মায়া জন্মায়। সেটা আমি আবিষ্কার করি কলকাতা ত্যাগ করার সময়।"

এরপর বৈচিত্র্যহীনভাবে কৃষ্ণনগর, দিনাজপুর, আবার কৃষ্ণনগর; সেখানে সুদীর্ঘ জ্বর ভোগ—এর মধ্যে দুএকটি টুকরো টুকরো চরিত্র

অগোছালোভাবে সাজানো, একটি দুটি লাইনেই তাদের উদযাস্ত সমাপ্ত। প্রথম পরিচয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে,—এ ক্ষেত্রে যে উচ্ছ্বাসটুকু আশা করা গিয়েছিল তাও নেই। শুধু বল্লেন "রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে, আমি প্রথমেই আবিষ্কার করি তিনি দেহে ও মনে একটি লোকোত্তর পুরুষ।"—এরপর আবার কলকাতা। ক্রমশই লেখকের ধৈর্য্য কমে আসছে যত শেষের দিকে চলেছেন তত যেন আত্মকথনের আর উৎসাহ থাকছে না।

কিন্তু সৌভাগ্য আমাদের—'আত্মকথা'র ঠিক এইখানে এসে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্যটি সংক্ষেপে সারলেও রবীন্দ্র-নাথকে কেন্দ্র করেই প্রমথ চৌধুরী আবার মুখর হয়ে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথ কেমন করে তাঁর জীবনে সাহিত্য আর সঙ্গীতরসভোগের সুর বেঁধে দিয়েছেন সে কথা অকৃপণতার সঙ্গে তিনি বলে গেছেন। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগের কথা বার বার বলেছেন। এই অংশেই কেবল দেখি ঘটনার ঘাট থেকে মাঝে মাঝে কল্পনার পালতোলা নৌকা চলেছে। লেখক মনের ভিতরকার দুয়ার খুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আজীবন শ্রদ্ধা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গলাভ, সব মিলে এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বিষণ্ণ-স্পর্শে এই অংশেই দেখা গেল খর-বুদ্ধিবাদী প্রমথচৌধুরী অন্তরের দু একটি অনুভূতি পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

তারপর লেখক ইউরোপ ভ্রমণে গেলেন—'আত্মকথা'র ছেদ পড়লো ঐখানেই।

'প্রকাশকের নিবেদনে' দেখা যাচ্ছে যে তাঁর অসুস্থতার জন্য বই আর এগোয়নি—বোধহয় আবার নূতন করে লেখা সুরু করবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। যে ভাবে লিখেছিলেন 'আত্মকথা' তাতে বেঁচে, থাকলেও আর কিছু লিখতেন কিনা বলা শক্ত। শেষের দিকে রবীন্দ্র-

প্রসঙ্গটুকু না এসে পড়লে বোধহয় আরও আগেই থেমে যেতেন। বেশ বোঝা যায়, যে সমস্ত ঘটনা বেছে বেছে আত্মকথায় স্থান দিয়েছেন সেগুলোর অধিকাংশই 'আত্মকথা'র পক্ষে অবান্তর—অন্ততঃ আরও অনেক প্রাসঙ্গিক ঘটনার উল্লেখ বোধহয় হতে পারতো। কিন্তু এই অন্যমনস্কতা তাঁর বক্তব্যকে ভাবদীপ্ত না করে তুললেও তাঁর কথন-ভঙ্গীর চারুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি কোথাও। তীক্ষ্ণ বর্শাফলকের মতো ধার আর দীপ্তি দুই-ই প্রমাণ করছে এ রচনা তাঁরই, আর কারো নয়—তা ঘটনা যতই এলোমেলো আর সাধারণ হোক্।

যাত্রী—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিক কালে বাংলাভাষায় যত আত্মজীবনী লেখা হয়েছে, সৌম্যেন্দ্রনাথের 'যাত্রী' তাদের মধ্যে বিশিষ্টতম। এই একখানি বই লিখেই সৌম্যেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের দরবারে পাকাপাকি আসন করে নিয়েছেন। আত্মজীবনী হিসাবে অর্থাৎ নিজের জীবনকে বিকশিত করার ইতিহাস হিসাবেই যে তাঁর 'যাত্রী' শ্রেষ্ঠ বই তা নয় শুধু, তাঁর নিজস্ব একটা গদ্যভঙ্গী আছে সে ভাষা যেমন কাব্যময় তেমনি বলিষ্ঠ ও সতেজ। তারাশঙ্কর, উপেন্দ্রনাথ বা সজনীদাসের মতো গল্পসর্বস্ব নয় তাঁর লেখা, অথচ গল্পের অভাব নেই 'যাত্রী'তে। আত্ম-বিশ্লেষণ আছে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, একটি গভীর জীবনবোধ সমস্ত লেখার মধ্যে ফুটে ওঠে। আর সবচেয়ে বেশি করে দেখি ঠাকুর পরিবারের সেই এসথেটিক আবহাওয়ার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নূতন জীবনমূল্য গ্রহণের নিরন্তর সাধনামত্ত এক তরুণকে, যার আছে প্রদীপ্ত আত্মবিশ্বাস, দুর্জয় সাহস আর নূতনকে গ্রহণ করবার, বিচার করবার দারুণ আগ্রহ। বলিষ্ঠ চরণে জীবনের রাজপথে একলা চলার মানুষ সৌম্যেন্দ্রনাথ। বাংলাদেশের বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ইতিহাসে তিনি একক এবং অনন্য। বিচারবুদ্ধির ধারালো খড়্গ দিয়ে তিনি যে পথ কেটে চলেছেন তাতে কোন মোহগ্রস্ততার সঙ্গে আপোষ নেই। সকলে যে পথে চলে সফল হয়েছে, জনতার করতালিতে সন্তুষ্ট হয়েছে সে পথ দিয়ে চললে আজ জনচিত্তে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতো। কোন্ আদর্শবাদের প্রেরণায়, কোন্ শিক্ষায়, কোন্ পরিবেশে তাঁকে

সাফল্যের সহজ পথ থেকে সরিয়ে এই আপাতঃব্যর্থ দুর্গম বিফলতার পথে ঠেলে দিল 'যাত্রী' তারই ইতিহাস।

সব দিক দিয়ে ঠাকুরবাড়ীর লোকেরা যখন প্রাণের উচ্ছল আবেগে, শিল্পে, সাহিত্যে, চিত্রকলায়, সঙ্গীতে নিত্য-নূতন সৃষ্টির জোয়ার এনে দিয়েছেন, দেশ যখন তাঁদের নবজাগরণের হোতা বলে স্বীকার করে নি-য়েছে তখনই সৌম্যেন্দ্রনাথের জন্ম। সেই ভরাপ্রাণের স্রোত কেমন করে নানাদিক দিযে দেশকে প্রাচুর্যে ভরিয়ে তুলছিল, দেশের হৃদয়ভূমিতে নিত্যনূতন সৃষ্টির বীজ বপন করেছিল তা তিনি দেখেছিলেন। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সেই পুরাণো দিনগুলির ছবি ফুটেছে, সুর বেজেছে, আবার অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে তিনি তার বিচার-বিশ্লেষণও করেছেন। সেই অবস্থার মধ্যে জীবনের ভিত্তি গড়েছিলেন তিনি। কোন সংকীর্ণতা, কোন গতায়ু সংস্কার তাঁর দৃষ্টিকে যে মোহমুগ্ধ করেনি তার কারণ ঐ সব মহাপ্রাণ লোকেদের সংসর্গ তাঁর মনের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বস্ত বলিষ্ঠতার সুর বেধেছিল। সেই সুর তাঁকে অকস্‌ফোর্ডের স্বপ্ন থেকে সরিয়ে এনে গান্ধীজীর আন্দোলনে নামিয়েছে, সেই সুরই তাঁকে দেশবন্ধুর রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হতে দেয়নি, সেই সুরই শেষ পর্যন্ত তাঁকে কমিউনিজমের রাজপথে বহুশত্রুবেষ্টিত হয়েও একলা চলবার সাহস যুগিয়েছে।

'যাত্রী'র প্রথম অংশের অনেকটাই সেই পুরাণো দিনের ছবিতে ভরা। কিন্তু সে ছবি যেখানে অস্পষ্ট লেখক তাকে কোথাও স্পষ্ট করে নিজের পরিণত বুদ্ধির রং লাগিয়ে আমাদের সামনে হাজির করেন নি। তাঁর চেতনার যা বাইরে ছিল তাকে কোনক্রমেই তিনি নিজের স্মৃতির মঞ্জুষা থেকে আহৃত বলে চালান নি। তাকে পরিণত বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাচীন কালের সম্বন্ধে যেমন গভীর

অনুভূতি আর দরদ আছে তেমনি সে কালকে বিচার করে তার মূল্য যাচাই করার চেষ্টাও আছে। শুধু ঐতিহাসিকের তথ্যানুসন্ধান নয়, শুধু দার্শনিকের তত্ত্ববিলাস নয়, শুধু সাহিত্যের ফুল ফোটানো নয়, তথ্য, তত্ত্ব আর রসসৃষ্টি একই সঙ্গে মিলিত হয়ে 'যাত্রী' পরম রসবস্তু হয়ে উঠেছে। সাহিত্যজগতে লেখকের কোন বিশেষ মূল্য বা মর্যাদা ছিল না 'যাত্রী' লেখার আগে, তাঁর একমাত্র পরিচয় ছিল তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বের। রাজনীতি-কেন্দ্রিক যত লেখা লিখেছেন সেগুলোর মূল্য যাই হোক না কেন তার থেকে তাঁর সাহিত্যিকের মর্যাদা লাভ হয়নি। 'যাত্রী'ই একমাত্র বই যা তাঁকে সাহিত্যিকের সুনিশ্চিত মর্যাদা দিয়েছে।

নিজেকে প্রকাশ করার একটা দুর্দম বাসনা যে আগাগোড়া তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে তা তখনই বুঝি যখন দেখি ঘটনার চেয়ে তিনি নিজের বিশ্বাস, নিজের উপলব্ধির কথা অনেক বেশী জোর দিয়ে বলেছেন। যে সব ঘটনা দিয়েছেন তার অধিকাংশই ঐ উপলব্ধির ধারাটিকে বোঝবার জন্য দিয়েছেন। একটি তরুণ প্রাণের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, রাজনীতির বিপদসংকুল পথে তার তীব্র আকর্ষণ কেমন করে জীবনরহস্যের তত্ত্ব উপলব্ধিতে তাকে সাহায্য করে, মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ করে দেয়, সেই ইতিহাসই 'যাত্রী'র বক্তব্য। নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি নিজেকে রোমান্টিক বলে আখ্যা দিয়েছেন। যে অর্থে তিনি নিজেকে রোমান্টিক বলেছেন সে অর্থে রোমান্টিক হতে গেলে কোন মুগ্ধ স্বপ্নলোকের বাসিন্দা হওয়া চলেনা, যে কথাটা তখন জোর গলায় বলতে হয় তা হলো এই "জীবনের সদর রাস্তায় একরাশ ধুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাঙ্গা পাঁজরের স্তূপ নিজের এই জীবনের দিকে মাথা তুলে অবিকম্পিত কণ্ঠে বলতে হবে; জাতে আমি রোমান্টিক,

তাই বিপ্লবী।" বাংলা সাহিত্যে যত আত্মজীবনী আছে তার অধিকাংশই বেশ পরিণত বয়সের লেখা তাই শেষ পর্যন্ত একটা গভীর প্রশান্তির সুর সেই লেখাগুলিতে বেজে ওঠে। দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিতে, প্রমথ চৌধুরী বা অবনীন্দ্রনাথের লেখায়, শিবনাথ শাস্ত্রী বা কৃষ্ণকুমার মিত্রের লেখায় পরিণত জীবনের পিছন ফিরে তাকানোর ছবি আছে। তারাশঙ্কর আধুনিক হলেও পিছনে ফেলে আসা দিনের স্মৃতি নিয়েই খেলা করেছেন। সৌম্যেন্দ্রনাথের জীবন কোন প্রশান্তির সুরকে শেষ সম্বল করে চলেনি কেবলই সংঘাত, কেবলই সংঘর্ষ, চলার সঙ্গে নূতন নূতন মূল্যবোধ গ্রহণ—এই নিয়েই তাঁর আত্মজীবনী। থেমে যাওয়া পথিকের স্মৃতি-রোমন্থন নয়, এ যেন অত্যন্ত গতিশীল প্রাণের দুর্বার যাত্রার ইতিহাস।

বাংলা দেশের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে আত্মজীবনী বিশেষ কেউ লেখেন নি। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন ইংরাজীতে, বারীণ ঘোষ লিখেছেন আত্মজীবনীর নামে চমকপ্রদ ঘটনার তালিকা, কিন্তু পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি এ দুটির কোনটিই। সুভাষচন্দ্রের রচনা অত্যন্তই অসমাপ্ত, সে রচনা তাঁর প্রতি সুবিচার করে না। সৌম্যেন্দ্রনাথের রচনায় ব্যক্তি যেমন তার নিজস্ব রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে তেমনি সমসাময়িক কালও অবহেলিত হয়নি। ব্যক্তি আর সমাজ উভয়কে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই লেখকের কৃতিত্ব।

অল্প বয়সের কথা অতি অল্পই লেখক বলেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অস্পষ্ট ছায়ার মত যে ছবিটি ভেসে উঠেছে মনের পটে তা হলো এই—"এক ধবধবে মূর্তি শাদা দাড়ি, বসে আছেন এক বড় চৌকীতে, আর মনে পড়ে ছাদের উপর রিক্সায় ঘুরছেন এক বুড়ো, খুব অস্পষ্ট মনে আছে যে মাঝে মাঝে আমিও যেন তাঁর সঙ্গে রিক্সায় ঘুরেছি।......

আমার স্মৃতির মঞ্জুষায় তাঁর সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী আর কিছু নেই।" দু একটি লোককে অস্পষ্ট মনে পড়েছে তাদের সম্বন্ধে দু একটি কথা বলেছেন। তাদের কথা ততটুকুই বলেছেন যতটুকু নিজেকে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজন হয়েছে। মনে পড়েছে ঝিল্লু ফরাসের ছোট্ট ছেলেটিকে, যাকে চৌবাচ্চায় ফেলে পিতার কাছে শাস্তি পেতে হয়েছে। গরীব বলেই কারুর উপর অত্যাচার হবে এ অবস্থা পিতা সুধীন্দ্রনাথ কখনো সহ্য করতেন না। সেইটুকু দেখানোর জন্যই ঐ ঘটনার অবতারণা। কাকা কৃতীন্দ্রনাথ কোটপ্যাণ্ট টাই পরিয়ে দিয়েছেন, পিতা সেই সব বেশ খুলে দিলেন। এই ঘটনা সেদিনকার জোড়াসাঁকোর বাড়ীর আবহাওয়াটিকে প্রকাশ করে। সেদিন দেশী জিনিষ ব্যবহার, দেশী জিনিষ পরার হাওয়া উঠেছে বাড়ীতে। এই স্বদেশী যুগের স্মৃতিও লেখকের খুব মনে নেই। কিন্তু একটি গল্প উদ্ধার করেছেন বিস্মৃতির অতল থেকে, যা পড়ে পাঠকের চোখে একটি অনবদ্য ছবি ভেসে উঠবে এবং নিজের অজান্তেই একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাঠক বলবে কোথায় গেল সে সব দিন। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর উঠানে লোক ভরে গেছে। সেই স্বদেশী উত্তেজনার দিনে, সেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধের দিনে—"আমার বয়স তখন পাঁচ বৎসর হবে, মনে পড়ে বাড়ীর উঠোন ভরে গেছে লোকে, আমার দাদা দিনেন্দ্রনাথ মাথায় গেরুয়া পাগড়ী, গায়ে আলখাল্লা আমাকে তাঁর কাঁধে বসিয়ে তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গান ধরেছেন 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি', 'বাংলার মাটি বাংলার জল'। আমি তাঁর কাঁধের উপরে বসে গাইতুম তাঁদের সঙ্গে। স্বদেশী যুগের যে স্মৃতি মনে আছে তার মধ্যে এই স্মৃতিই জ্বলজ্বলে হয়ে আছে।" চোখের সামনে ছবি ফুটিয়ে তোলার কঠিন শক্তির অধিকারী সৌম্যেন্দ্রনাথ। স্পষ্ট ভেসে ওঠে মনে, সেই

উদাত্তকণ্ঠের অধিকারী সুপুরুষ সুগঠিত তনু দিনেন্দ্রনাথ বাংলার সেই পরম তীর্থক্ষেত্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর উঠানে মাথায় গেরুয়া পাগড়ী পরে, আলখাল্লা পরে কাঁধের উপর ছোটভাইটিকে নিয়ে সুর ধরেছেন। তাঁর সেই গভীর হৃদয়-ছোঁওয়া কণ্ঠস্বর সমস্ত প্রাঙ্গণে আবেগের থর থর কম্পন জাগিয়ে তুলেছে। প্রাঙ্গণভরা লোক সেই সুর মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছে।

একদিকে যেমন দেশাত্মবোধের প্রবল জোয়ার তাঁর শিশুচিত্তকে নানাদিক থেকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে অন্যদিকে তেমনি বাড়ীতে নানা শিল্পীর সমাবেশ গানে, সাহিত্যে, শিল্পে একটা গভীর রসবোধ ও রুচির মাত্রা ঠিক করে দিয়েছে। রাধিকা গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র তখন তাঁদের সঙ্গীতশিক্ষক, পিতার ঘরে দেবেন্দ্রনাথ সেন, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, সুরেশ সমাজপতির নিয়মিত আনাগোণা। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজে তখন সে বাড়ীর ভাবমণ্ডলের কেন্দ্রে রয়েছেন। এগারোই মাঘের উৎসবে গানের জন্য ডাক পড়ে মাঝে মাঝে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বালক সোমোন্দ্রনাথকে গানের সঙ্গী করে নিয়েছেন—"একবার এগারোই মাঘে····· রবীন্দ্রনাথ আর আমি দুজনে 'তুমি যত ভার দিয়েছ' এই কীর্ত্তনটি গাই।" তাঁর মাও গান জানতেন। মার মুখ থেকেই গান শিখেছেন।

রোমান্টিক লোক যখন নিজের অতীত দিনের বিস্মৃতপ্রায় কাহিনীর পুনরুদ্ধার করতে বসে তখন সেই অতীত তার কাছে ফিরে আসে স্বপ্নলোক হয়ে। সেই হারিয়ে যাওয়া দিনের জন্য তার ক্ষোভের শেষ থাকে না। নানা তুচ্ছ ঘটনা তখন কত বিচিত্র রূপ ধরে সামনে এসে দাঁড়ায়। মন বিভোর হয়ে যায়। শিশু জীবনের সেই সব—দেখা, সব-ছোঁওয়া মন এই পরিণত জীবনের কাছে কালের ব্যবধান পেরিয়ে

যে ছবিগুলি পৌঁছে দেয় সেগুলি আসে রূপকথার ছবি হয়ে। সেদিন বাড়ীর দক্ষিণে যে বাগান ছিল সে বাগান শিশুর মনের কাছে এক অপরূপ রূপকথার রাজ্য সৃষ্টি করতো—"বাগানটা আর বাগানই থাকতো না আমার কাছে। তার পাঁচিল রেলিং কোথায় যেন সব মিলিয়ে যেতো। সমস্ত বাগানটা হয়ে উঠতো যেন রূপকথার তেপান্তরের মাঠ। সেই মাঠ দিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে চলতো মন কতো নদনদী পার হয়ে ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমীর দেশে। বিশেষ যে কিছু ভাবতুম তা নয় সমস্ত শরীর মনকে কে যেন বেঁধে দিতো রূপকথার সুরের পর্দায়।" এই রূপকথার সুর বাঁধা হয়েছিল জোড়াসাঁকোর বাড়ীর পরিবেশে। সেই সুর সারাজীবন ধরে আর সব সুরকে ছাপিয়ে বাজলো। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময়ও পড়া ফাঁকি দিয়ে সেই মাঠে বসে বাঁশী বাজানো, সেই সাঁওতাল গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো, আর পরবর্তী জীবনে পাটোয়ারী রাজনৈতিক নেতাদের হাতে পরাজয়, সেই স্বাপ্নিক মানুষটিকেই প্রকাশ করে। জীবনে আদর্শবাদের যে ছোঁওয়া লেগেছিল সে কখনও কূটনৈতিক রাজনীতির চালবাজীর পথে চলতে দেয়নি। নিজের জীবনের ব্যর্থতার আসল কারণটুকু তাঁর বুঝতে দেরী হয় না। তাই 'যাত্রী' পড়লে সহজেই বোঝা যায় কেন জীবনের সহজ সাফল্যের পথে সৌম্যেন্দ্রনাথের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই মিলুলো না। ১৯নং ষ্টোর রোডের বাড়ীতে একবার তিন-পুরুষের দোল খেলা হয়েছিল—মহর্ষির পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তাঁদের পরবর্তী সুধীন্দ্রনাথের সমসাময়িকেরা এবং সৌম্যেন্দ্রনাথের ভাই বোনেরা—যথেষ্ট ক্ষোভ আছে মনে, সেই স্মৃতির দিনগুলি আর ফিরে আসবে না "কোথায় গেলো সেই ১৯ নম্বরের বাড়ী, পুকুর আর সেই বাঁধানো বকুলতলা। আজ ধনী মারোয়াড়ীর কবলে সেই

বাড়ী শেয়ার বাজারের রুচির পেষণে আর্তনাদ করছে।" রোমান্টিক মন অতীতের ফেলে আসা দিনগুলির জন্য ব্যাকুল, রোমান্টিসিজমের ধর্মই হলো অতীতবিলাস। ঠাকুর পরিবারের অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে এই দীর্ঘশ্বাস, অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' বা 'জোড়াসাঁকোর ধারে' স্মরণ করিয়ে দেয়।

পুরানো দিনের ঠাকুরবাড়ীর দু একটি চরিত্র আমাদের কাছে মনোরম হয়ে দেখা দিয়েছে 'যাত্রী'র মধ্য দিয়ে। কিন্তু তাঁদের পূর্ণ পরিচয় দিয়ে বংশবৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্য লেখকের ছিল না। একটি দুটি রেখায় যেমন করে মেজাজী শিল্পী পুরো ছবি না এঁকেও একটা পূর্ণতার আভাস দেন মনে, ঠিক তেমনি সৌম্যেন্দ্রনাথের লেখায় ফুটে উঠেছেন দেবেন্দ্রনাথের বড় মেয়ে সৌদামিনী মহর্ষির পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী ও প্রফুল্লময়ী।

স্কুলের জীবন 'যাত্রী'র মধ্যে অতি অল্প স্থান জুড়ে আছে। শিক্ষার সেই প্রাথমিক সূচনার কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইতিহাস নেই। 'ফ্রোবেল ইনষ্টিটিউশনে'র মাষ্টার পূর্ণবাবুকে মনে পড়ে বোধহয় রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতি অবজ্ঞা ছিল বলেই। স্কুলের স্মৃতি ঐখানেই শেষ। কিন্তু ঐ বয়সের মনের বিকাশের একটি ইতিহাস লেখক পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বাড়ীর আশেপাশে, ছাদের আনাচে কানাচে, সিসু গাছের ডালে ডালে শিশুর মন আত্মবিস্তারের পথ খুঁজে পেয়েছে। ছোটকাকীকে জড়িয়ে ধরে সন্ধ্যাবেলায় গল্প শুনতে শুনতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতো। সেই নিঝুম দুপুরের রোদে তেপান্তরের মাঠের পক্ষীরাজগুলো দলে দলে ঘাড় বেঁকিয়ে ছুটে চলে, শিশুমনে কল্পনার বাহন তারা—"সন্ধ্যের আলো সিসু গাছটার পাতার মধ্যে ঝলমল করতো, গলির মোড়ে শিবের মন্দিরে বাজতো আরতির ঘণ্টা, চিলের

কোঠাগুলো আবছা হয়ে আসতো অন্ধকারে, আমার পক্ষীরাজ ঘোড়াগুলো তাদের কালো কেশর ফুলিয়ে থামতো এসে বাড়ীর ছাদে ছাদে।" শিশুমনের সেই রঙীন দিনগুলি এমনি করে স্পর্শপ্রবণ মন নিয়ে লেখক দূর থেকে দেখেছেন।

তাঁর প্রথম জীবনের বর্ণনা এক জাতীয় ট্রাজেডীর বর্ণনা। সেই প্রাণউচ্ছল জোড়াসাঁকোর বাড়ীর আলো নিভে আসছে ধীরে ধীরে, প্রদীপ নিভছে একে একে। এই ছবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নেই, অবনীন্দ্রনাথের মধ্যেও নেই।

মহর্ষির মৃত্যুর পর "দাদামশায় দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যাঠামশায় দ্বিপেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর পাট গুটিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে গেলেন।" দরদ-ভরা প্রাণ-উধাও-করা কণ্ঠস্বরের অধিকারী দাদা দিনেন্দ্রনাথও একদিন আসর ভেঙ্গে চলে গেলেন। ছোটকাকীর মৃত্যু দুঃখের প্রথম পরিচয় বহন করে আনলো জীবনে। এমনি করে ভরা প্রাণের নদী ক্রমশঃ শুকিয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু এক প্রদীপ তখন সহস্রের শক্তিতে জ্বলছে— একা রবীন্দ্রনাথ তখন গানের ঝরণা ধারা বইয়ে চলেছেন, বাড়ীর ছেলেমেয়েরা করছে অভিনয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে অভিনয় করেন তখন, ষ্টেজ সাজান অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল। কাকা রথীন্দ্রনাথ ছেলেদের নিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্য আলোচনা করেন। "এমনি করে নিজের অজানিতে মনের মধুকোষে সঞ্চিত হতে লাগলো রস, রুচির পর্দা বাঁধা হতে লাগলো এমন এক সুরে যা আজ পাত পেড়ে আঙ্গুল চেটে মোটা রস পান করবার প্রগতি সাহিত্যের যুগেও নামিয়ে আনতে পারেনি।" এই যে রূপকথার সুর-বাঁধা জীবন সেই জীবন তাঁর মনে স্বপ্ন যুগিয়ে চলেছে অবিরত। মন আশা করেছে অনেক, কিন্তু পৃথিবীর ঐশ্বর্য কখনোই সেই স্বপ্নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠেনি। রূপ মনের

মধ্যে মূর্তি নিয়েছে, কিন্তু বাইরের জগতের রূপ সেই রূপপিয়াসী মনের মত হয়না কিছুতেই। মানুষের মন তার নিজের জন্য নতুন নতুন সমস্যা করে চিরদিন, সংসার যতটুকু তাকে দেয় তা কখনোই তার চাওয়া মেটায় না। পূর্ণতার আদর্শ, পূর্ণতার কল্পনা মনের মধ্যে জেগে থাকে বলেই মানুষ বাস্তবের অসঙ্গতির বিরুদ্ধে মুখোমুখী দাঁড়ায়, বাস্তবের বীভৎসতাকে সেই আদর্শের ধারণা অনুযায়ী বদল করতে চায়। নিজের ভিতরকার সেই অতৃপ্তিকে প্রকাশ করতে গিয়ে যে ব্যাখ্যা সৌম্যেন্দ্রনাথ দিয়েছেন তা যেমন জীবন সম্বন্ধে তাঁর গভীর চিন্তার পরিচয় বহন করে তেমনি তাঁর বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসের সুরটিকেও নিঃসংশয়ে প্রকাশ করে।

মেটিরিয়ালিষ্ট চিন্তাধারার যে সমস্ত সহজ ব্যাখ্যা চলিত আছে তার সঙ্গে পদে পদেই তাঁর সংঘাত লেগেছে। চলতি ব্যাখ্যায় মেটিরিয়া-লিজম আর রোমানটিসিজম দুটো পরস্পর—বিরোধী ধারণা। এর মধ্যে কোথাও কোন মিল নেই। সুতরাং যারা বিপ্লবের কথা বলে যারা শ্রেণী সংঘাতের কথা বলে তারা নিজেদের রোমান্টিক বলে ঘোষণা করবে এটা কেমনতর কথা। এমনিতর সমালোচনা যে তাঁর বিরুদ্ধে উঠবে তা লেখকের অজানা ছিল না। তাই এই প্রত্যাশিত সমালোচনার উত্তর তিনি আগে থাকতেই দিয়ে রেখেছেন তিনি বলেছেন যে রোমানটিসিজম বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, তা হলো বাস্তবের দৈন্য এবং অপূর্ণতাকে গভীর ভাবে অনুভব করে বাস্তব পরিবর্তনের কাজে লাগবার প্রেরণা। "বাস্তবের দীনতা, অপূর্ণতা, ক্রূরতা, নোংরামি অসহ্য, পূর্ণতার ছবি মন দেখেছে। এই দীনতা ক্রূরতা দূর করে সেই পূর্ণতা আনতেই হবে জীবনে, বের হয়ে পড়ো পথে। এই হোলো রোমানটিকের ডাক। এই ডাকে আমার প্রাণ সাড়া

দিয়েছে। এই ডাকেই আমার প্রাণ তার পূর্ণ রস পেয়েছে। এই জন্যেই আমি রোমানটিক আর রোমানটিক বলেই আমি বিপ্লবী। রোমানটিক বলেই আমি বিপ্লবী এই কথাটা আধুনিকদের কানে তো বেসুরো বাজবেই, তাদের বাদ দিয়েও অনেকের কানে বেসুরো ঠেকবে।" আত্মবিশ্লেষণের এই বলিষ্ঠ সুর, আত্মপ্রকাশের এই তেজস্বী ঘোষণা অন্য আত্মজীবনীতে তো পাওয়া যাবেই না, বাংলা সাহিত্যেও আত্মঘোষণার এই প্রচণ্ড দীপ্তির তুলনা নেই।

সমস্ত বইটা পড়ে সহজেই এ কথা মনে হতে পারে যে লেখকের চরিত্রে একটা প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য আছে, যে ঔদ্ধত্য তাঁকে সংসারের অনেক জিনিষ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে শিখিয়েছে। তাঁর আপোষ বিরোধী মন যেখানে সুর মেলাতে পারেনা সেখানে নির্মম হয়ে ওঠে। দেশবন্ধুর রাজনীতি তিনি পছন্দ করেন নি. সে কথা ঘোষণা করতে কোথাও কোন দ্বিধা ছিল না তাঁর, যে বন্ধুর সঙ্গে একদিন 'দেশ' পত্রিকা বার করার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই বন্ধু যখন হিন্দুমহাসভাপন্থী হলো তখন পথ আলাদা হলো দুজনের; উৎসব আর নাচ গান করে পয়সা তুলে যে বন্ধুর খাবার জুটিয়েছেন এক সময়, সেই বন্ধুর সঙ্গে মত মিললো না। কিন্তু কোথাও আপোষ করেননি। রোমানটিক মন কিভাবে লড়াই করে চলেছে জীবনভোর, সেই কথা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে লেখক বলেছেন। তাঁর এই বাইরের জীবনের ঔদ্ধত্যের যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছেন তা মনে রাখবার মতো। "আমার প্রাণের এই রোমানটিক রস আমাকে একরোখা, জেদী আর আপোষ-অসহিষ্ণু করে গড়ে তুলেছে। বাস্তবের সঙ্গে আপোষ করতে রাজী হইনি সারাজীবন। আদর্শের অন্ধকার পথে মন যাত্রা সুরু করেছে একদিন, সে অভিসার কি কখনো সম্ভব আপোষের বাঁধা সড়কের পথে।"

এই রোমান্টিক মনই তাঁকে তাঁর প্রথম জীবনের প্রেমের ছবি ফোটানোর শক্তি দিয়েছে। অন্য কোন বাংলা আত্মচরিতে প্রেমের এই প্রথম সমারোহের চিত্র নেই। আধুনিক মানুষ, বিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত বাংলার রোমান্টিক যুবক প্রেমের সেই প্রথম আবির্ভাবকে অস্বীকার করতে পারে নি। কিন্তু সেই প্রথম প্রেম সামাজিক সম্মতি পেয়ে জীবনে চিরন্তন হয়ে ওঠেনি। প্রাণের গভীরে একটি রুদ্ধকক্ষে আঘাত করে নূতন অনুভূতির স্রোত উন্মুক্ত করে সেই প্রথম যৌবনের দিনগুলি চলে গেছে। নানা পথের প্রান্ত পার হয়ে চলেছেন, কত লোক এলো, কত দিন গেলো, কিন্তু সেই প্রথম প্রেমের দীপ্তি এতটুকু ম্লান হয়নি। সমালোচকদের দুঃখ আছে যে বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃতি নেই, যে সমস্ত আত্মজীবনী আছে তারা শুধু অতীতের সাফাই গায়। দুঃখ তাদের ঘুচবে সৌম্যেন্দ্রনাথের প্রথম প্রেমের কাহিনী পড়লে। প্রথম তারুণ্যের উৎসাহে অথবা প্রিয়া মানবীর দেহে ধরা দিয়েছিল। সব-কূল-ডোবানো প্রেম সেদিন সব ঈর্ষাদ্বেষজাত সমালোচনাকে তুচ্ছ করার শক্তি দিয়েছিল "বাড়ীতে আবহাওয়াটা তখন থমথমে হয়ে উঠেছে আমাকে ঘিরে। সেইটেই ছিল আমার পক্ষে অসহ্য। ভিতরটা হচ্ছিল ক্ষতবিক্ষত, বাইরে ছিল আমার জিদের বেপরোয়া ঠাট। বংশমর্যাদা, সমাজ এই সব দানবের ভয়ে ভীত আমার বাড়ীর লোকেরা আমার ভালবাসাকে মোহ বলে প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। কাছের লোক বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ চিনতে পারে না আর সত্যি করে তারা ব্যক্তির আপনার লোকও নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রক্তের সম্বন্ধ যার সঙ্গে সে আত্মীয় অনাত্মীয়।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে হলো, পথ ছাড়তে হলো। সৌম্যেন্দ্রনাথ আত্মীয়দের উপর দোষ চাপিয়ে নিজের সাফাই গাননি। নিজের সাময়িক দুর্বলতা সেদিন

কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। অত্যন্ত স্পষ্ট সেই স্বীকৃতি, রোমান্টিক মানুষের গভীর অন্তরের বেদনা মথিত সেই স্বীকৃতি।

"তবু একদিন আমাকে হার মানতে হোলো। হার মানতে হোলো মনের অনাত্মীয় কাছের লোকদের কাছে। তাইবা বলি কেন? হার মানলুম নিজের দুর্বলতার কাছে, নিজের কাপুরুষতার কালি দিয়ে ভালবাসার মুখে কালি দিলুম।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আবহাওয়ায় যে মানুষ, ব্রাউনিং-এর নিঃসংশয় আশার সুর যার জীবনে সাড়া পায় সে তো ব্যথাকেই শেষ সম্বল করে না। সেই ব্যথা থেকেই তার মনে বিশ্বাসের দীপ্তি জ্বলে ওঠে—"প্রাণের বন্ধ তালা যখন খুলে দিলো গভীর বেদনা, তখন দেখলুম মানুষের উপর পরম বিশ্বাসের মাণিক জলছে প্রাণের সেই মণিকুঠরীতে। ব্যথা আমাকে অবিশ্বাসী করেনি মানুষের সম্বন্ধে। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানোর পাপ থেকে, অবিশ্বাসের অপমৃত্যু থেকে আমার ব্যথা আমাকে বাঁচিয়েছিল। দরদ ও বিশ্বাসের তারে আমাকে পৌঁছে দিয়ে ব্যথার বড় দিগন্তে মিলিয়ে গেলো।" এই আত্মঘোষণা বাংলা সাহিত্যের আত্মকথাগুলিতে একক এবং অনবদ্য।

রাজনীতি কোনদিন রাজনৈতিক সৌম্যেন্দ্রনাথের সমস্ত মন জুড়ে বসতে পারেনি। কূটনৈতিক রাজনীতি তাঁর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায়নি। সাময়িক সাফল্যের দিকে যারা কখনো ফিরে তাকায়নি তারা রাজনীতির হাটের বেচাকেনায় চিরকাল ঠকেছে। রাজনৈতিক চালবাজীতে ওস্তাদ বহু লোকের কাছে পরাজয় ঘটেছে তাঁর বার বার। কিন্তু সে পরাজয় তাঁকে কোথাও চরম আঘাত হানতে পারেনি। কারণ তিনি বিশ্বাস করেছেন, হার শুধু নিজের দুর্বলতার কাছেই, আদর্শের তপস্যার তাল কাটলেই হার, তা না হলে আর হার নেই।

তাই গান্ধীজীর ডাক নিছক রাজনীতির উদ্দেশ্য সাধনেই শেষ হয়ে যায়নি। যদি রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্যই একমাত্র উদ্দেশ্য হতো তবে গান্ধীজীর রাজনীতি থেকে সরে যাবার পরেও গান্ধীজীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা থাকার কোন কারণ পাওয়া যেত না। কিন্তু শুধু তো রাজনীতি নয় আদর্শের জন্য ব্যক্তিগত লোভ পার হয়ে যে একনিষ্ঠ সাধনা সেই সাধনার ক্ষমতা যুগিয়েছেন গান্ধীজী। রাজনৈতিক সাধনার ক্ষেত্রে গান্ধীজী তাঁর মনকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, জাগ্রত করেছেন। গান্ধীজীর থেকে শুধু দূরে সরে নয়, গান্ধীজীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম করার পরেও গান্ধীজীর প্রতি এই শ্রদ্ধা যে তাঁর অটুট ছিল তাতেই প্রমাণ করে যে রাজনীতির চোরাকারবারীদের হাটে ভীড় জমাতে গেলে যে বুদ্ধির প্রয়োজন সে বুদ্ধি তাঁব নেই।

রাজনৈতিক জীবনেব চলাফেবা যেখান থেকে বলতে স্থরু করেছেন সেখান থেকে এই আত্মকথা আরও মনোরম হয়েছে। শুধু মনোরম বল্লে ভুল হবে, তা গভীরভাবে আমাদের মননশীলতাকে জাগিয়ে তোলে, রাজনৈতিক বহু তত্ত্বকে সহজ করে আমাদের অনুভূতি ও উপলব্ধির বস্তু করে তোলে। পুঁথিগত বিশ্লেষণ কোথাও সে রচনাকে কঠিন করে তোলেনি। বুদ্ধি আর হৃদয়ানুভূতির স্থষ্ঠু সংযোগ তাঁব রাজনৈতিক জীবনের ইতিবৃত্তকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

জীবনের নানা ওলোটপালোটের মধ্য দিয়ে সৌম্যেন্দ্রনাথ এলেন কমিউনিজমের পথে। গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা কমেনি কিন্তু ধার্মিকতার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন তাঁর লেখাগুলি আর তেমন করে তাঁকে আকর্ষণ করেনি। এই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের স্থচনায় যে অল্পজ্ঞান নিয়ে পথচলা স্থরু হয়েছিল সে বৃত্তান্তও তিনি দিয়েছেন। পরবর্ত্তীকালের রাজনীতির ক্ষেত্রে কমিউনিজমের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রচারক কি সম্বল

নিয়ে রাজনৈতিক জীবন সুরু করেছিলেন সে ইতিহাস অনেকেরই কৌতূহল মেটাবে।

সৌম্যেন্দ্রনাথের ভাষা যেমন কোমল তেমনি কঠিন। অনুভূতির কোমল আভা যেমন ললিত ভাষায় ফুটে ওঠে, তেমনি কঠিন নির্মম ভাষায় তাঁর বিশ্বাস ফুটে ওঠে বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করে। সৌম্যেন্দ্রনাথের বাংলা মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গীকে কাঠামো করে থাকলেও তার একটা নিজস্বতা আছে যা পড়ামাত্রই অনুভব করা যায়। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর ঐতিহ্য সম্বন্ধে তিনি যেখানে আঘাত করেছেন সেখানে ভাষা তাঁর মানসিক দীপ্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচায়ক হয়ে নির্মম ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে :—

"জোড়াসাঁকোর বাড়ীর সংস্কারের মধ্যে অনেক কিছু ছিল যা অমিত শক্তিশালী, অন্যদিকে তার মধ্যে এমন অনেক কিছু ছিলো যা জমিদার পরিবারের বনেদী দুর্বলতার ক্লেদে কলুষিত। চিন্তার উদ্দেশ্য চিন্তাই, এই ভাববিলাসিতা ছিল সেই সংস্কারের মধ্যে। জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাববিলাসী আত্মকেন্দ্রিক জীবনের সংস্কার শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল আমাদের বাড়ীতে। দু' মুখো তরোয়ালের মতো, এই দু' মুখো সংস্কারের চিন্তার ও রসসৃষ্টির দিক ছিলো খরধার আর কর্মের দিকটা ছিল ভাববিলাসে মচে-পড়া ভোঁতা।"

ঐ একই লেখনী কি করুণ কোমলতার সৃষ্টি করেছে, যখন অসহযোগ আন্দোলনের সেই দিনগুলির বর্ণনা পড়ি তখন বুঝি :—

"সে কি আশ্চর্য এক সময়, কি অপূর্ব প্রাণের আলোয় ভরা সেই দিনগুলি! সবাই সেদিন আপনার হোয়ে গেছে, প্রত্যেকটি মানুষের কাছে দাবী জানাতে মনে এতটুকু সঙ্কোচ নেই। কত অজানা অচেনা বাড়ীতে ঢুকে গিয়ে সেদিন খদ্দর বেচেছি, টাকা আদায় করেছি......

স্মৃতির আয়নায় তার অস্পষ্ট রেখা ছবির মতো ভেসে ওঠে কখনো কখনো, কখনো বা ভুলে যাওয়া গানের সুরের মতো বাজতে থাকে আমার মনে আমার ছোটবেলার জীবনের সুরের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া স্বদেশী যুগের সুর।"

কোমলতা ও বীর্য একসঙ্গে হাতে হাত ধরে চলেছে তাঁর গদ্যে। যেমন বলিষ্ঠ ভাবা তেমনি বলিষ্ঠ তার আত্মঘোষণা। সৌম্যেন্দ্রনাথের 'যাত্রী' আত্মজীবনী সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট ধারার অবতারণা করলো। তার অনুসৃতি বাংলা সাহিত্যে আরও কোন নূতন পথিকের সন্ধান দিতে পারে। রাজনৈতিক জীবনের দুর্যোগ যখন ঘনিয়ে এসেছে তখন য়ুরোপের পথে পাড়ি দিলেন। 'যাত্রী' শেষ হলো সেইখানে।

পাঠক গভীর কৌতূহল নিয়ে জানতে চায়—তারপর কী? এই দুর্দান্ত প্রাণবান্ জীবনের তারপর কী হলো? দ্বিতীয় খণ্ডের আশ্বাস দিয়ে লেখক আমাদের খুসী করতে চেয়েছেন। তাইতে খুশী হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

আমার কালের কথা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্করের 'আমার কালের কথা' সতিসত্যিই তারাশঙ্করের আত্মজীবনী নয় আসলে, ওটা পুরোপুরি একটা উপন্যাস। সেই উপন্যাসের নায়ক তারাশঙ্কর নিজেই, নায়িকা তার মা। সেকালের ভেঙ্গে পড়া জীর্ণ সমাজব্যবস্থা তার সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও প্রাণবন্ততার যে উজ্জ্বলপ্রকাশে গৌরবান্বিত ছিল তারই পটভূমিকায় এই উপন্যাসের (বা আত্মজীবনীর) রচনা। তবু কেন আত্মজীবনীর আলোচনায় স্থান-পেলো 'আমার কালের কথা' সে প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠতে পারে। তার উত্তরটাই আগে দিয়ে নিই।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা-সাহিত্যে ছোটগল্প আর উপন্যাস রচয়িতাদের মধ্যে জনপ্রিয়তায় তারাশঙ্কব আর সবাইকেই ছাড়িয়ে গেছেন। স্বভাবতঃই গল্প বলার একটা সহজ সাবলীল ভঙ্গী ছিল তাঁর, যেমন ছিল শরৎচন্দ্রের। সেই ভঙ্গী শুধু কায়দা হিসাবেই যে সহজ তা নয়, তাঁর সাহিত্যের উপাদান তাঁর জন্মভূমির লালমাটির মধ্যে থেকেই তিনি নিয়েছেন, তাকে রূপ দিতে তাই তাঁর কোন চেষ্টা প্রকট হয়ে ওঠেনি। এ যেন কত দিনের চেনা, কতদিনের জানা মানুষগুলির গল্প বলে যাওয়া। কষ্ট করে নয়, চেষ্টা করে নয়, যেমন করে মনে আসে ঠিক তেমন করে বলা। নিজের কথা তারাশঙ্করের পক্ষে আর অন্য কোন উপায়ে বলা সম্ভব হতো বলে মনে হয় না, যখন 'আমার কালের কথা' পড়ি। তাই গল্পকার তারাশঙ্কর নিজের কথা বলতে বসে গল্পই বলেছেন, আত্মবিশ্লেষণের পথ ধরেননি, সব কথা বলা হলো কিনা সে কথা ভাবেন

নি, মনের পটে যে সব ঘটনা বহুকালের বিস্মৃতির পথ পার হয়ে এসে পৌঁচেছে তাদের নিয়ে আসর জমিয়েছেন। তাই গল্প হলেও, উপন্যাস হলেও তারাশঙ্কর নিজেকে প্রকাশ করেছেন বৈকি, সেকালের কথা বলতে বলতে একালের কিছু দীর্ঘশ্বাসও শোনা গেল। তাই 'আমার কালের কথা' গল্পযোজনা হলেও আত্মকথা।

বাংলাসাহিত্যে যে সব আত্মজীবনী সৃষ্টি হয়েছে তার ধারাবাহিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তারাশঙ্করের আত্মজীবনী ছাড়া আর কোন আত্মজীবনীই এমনি করে শুধু গল্প বলে শেষ হয়ে যায়নি। দেবেন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, এঁদের আত্মজীবনীতে গল্পের অভাব নেই মোটেও। কিন্তু তাঁদের জীবনীতে জীবনের একটা উপলব্ধির পরিচয় আছে যা তারাশঙ্করের আত্মকথায় নেই। তারাশঙ্কর যেন জীবনের বিচিত্র প্রকাশ দেখে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় স্তব্ধ অভিভূত হয়ে গেছেন। অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে তারাশঙ্করের আত্মকথা তাঁর বাল্যস্মৃতির বেশী কিছু নয়। বুদ্ধির যে পরিপক্ক স্তরে মানুষের জীবনে সমাজবোধ জেগে ওঠে তারাশঙ্করের আত্মকথা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে সে পরিপক্কতা আসেনি। আত্মকথা যেখানে শেষ হলো বালক তারাশঙ্কর তাঁর বালসুলভতা তখনও কাটিয়ে ওঠেননি। তাই অতি সঙ্গতভাবেই জীবনতত্ত্বের বহুলতায় 'আমার কালের কথা' ভাবাক্রান্ত নয়।

এমনি নিছক গল্প বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের মধ্যে যে এক স্বপ্নময় অতীতের দ্বার খুলে নিয়ে যান সে রাজ্যের সন্ধান তারাশঙ্করের মধ্যে নেই। তারাশঙ্করের কাছে বিগত অতীত তার বাস্তব মূর্তির ভালমন্দ নিয়ে দেখা দিয়েছে, অবনীন্দ্রনাথ সেই অতীতকে তাঁর সূক্ষ্মসৌন্দর্যবোধের রঙে রঙীন করে আমাদের সামনে

এনে দিয়েছেন। দুজনেই সেই হারিয়ে যাওয়া অতীতের জন্য দুঃখ করেছেন। কিন্তু বোধহয় বয়সের গুণেই অবনীন্দ্রনাথ সব ক্ষোভ, সব দুঃখকে উত্তীর্ণ হয়ে জীবনকে এক প্রশান্ত ভালবাসার নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছেন কিন্তু তারাশঙ্করের কাছে জীবন এত বাস্তব এত কঠিন যে সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির জন্য তার ক্ষোভের সীমা নেই। বোধহয় দেবেন্দ্রনাথ আর শিবনাথশাস্ত্রী ছাড়া আর সব আত্মজীবনীর লেখকই তাঁদের বিগত দিনগুলির জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দেবেন্দ্র-নাথের স্বাভাবিক নির্লিপ্ততা তাঁকে অতখানি ভাবপ্রবণ হয়ে উঠতে দেয়নি। আর শিবনাথশাস্ত্রীর কর্মময় জীবনে কোন বিগত দিনের জন্য দুঃখ প্রকাশের অবকাশই হয়নি।

আত্মজীবনী যাঁরা লেখেন অতীতের স্বপ্নমন্থন তাঁদের অলস সন্ধ্যাকে মোহময় করে তোলে নিশ্চয়ই। মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই একটু অতীত-বিলাসী। যাঁরা নিজেদের বিচার করতে বসেন, বিশ্লেষণ করতে বসেন বা নিছক নিজেকে জানানোর আনন্দেই আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁদের অতীতমুখী হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলেছেন অতি কাছে যে জীবন সে তো নানা অস্পষ্টতা নিয়ে দেখা দেখা দেয়; প্রতিদিনকার ছোটখাটো তুচ্ছতা সেখানে মাথা তুলে তার চেয়ে অনেক বড় আসতন নিয়ে দাঁড়ায়। যেমন করে মুসাফিরখানা ছেড়ে চলে যায় যে পথিক সে পিছন ফিরে চাইলে ছবির মতো মুসাফিরখানাকে দেখে তেমনি করে ফেলে আসা জীবনকে দেখা যায় নতুন করে ছবির মতো।' রবীন্দ্রনাথের সেই কথা 'চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে' আত্ম-জীবনীর পিছনেও প্রেরণা যোগায়।

তারাশঙ্করে দৃষ্টি রোমান্টিক দৃষ্টি—যা গেছে, যা বিগত তার জন্য একটা সুনিবিড় ব্যাকুলতা তাঁর মন ভরে আছে। সে অতীত আজ

স্বপ্নলোক, সেই স্বপ্নলোকের নানা কথা, নানা ব্যক্তি, নানা ঘটনা আজ মনের প্রান্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। কত লোক যে অবাঞ্ছিত, অযাচিত এলো, তাদের প্রাণের স্পর্শ রেখে গেল তার শেষ নেই। ভালো—মন্দ, সুখ-দুঃখ পাশাপাশি চলেছে। সেই প্রথম জীবনে অবাক্-বিস্ময়ে চোখ মেলে দেখা পৃথিবী অনেক কালের ব্যবধান পেরিয়ে লেখকের চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো। ব্যথায় বেদনায় হৃদয় বিধুর হলো, সেই বিধুরতার ম্লান স্পর্শ লেগে তারাশঙ্করের সেকাল সুন্দর হলো, মধুর হলো। হোক্ সে গল্প, না থাক বিশ্লেষণ তবু পাঠক খুসী হলো, কারণ মন ভরলো।

এ প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই ওঠে যে অল্পবয়সের যে সব ঘটনা অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলির সঙ্গে কল্পনা মিলেছে কতটা! আমার মনে হয় অধিকাংশ লেখকই তাঁদের ছোটবেলার কাহিনী বলতে বসে তাঁদের পরিণত মনের কিছু কিছু বাসনা তার সঙ্গে জুড়ে দেন। হয়ত এমন না-ও হতে পারে, কিন্তু যে নিপুণতার সঙ্গে তাঁরা অতি ছোট ছোট ঘটনা ব্যাখ্যা করেন তাতে এ কথা ছাড়া আর কিছু ভেবে নেবার উপায় নেই। অনেক জায়গাতেই তারাশঙ্কর তাঁর বক্তব্য থেকে সরে গেছেন। প্রসঙ্গান্তর ঘটেছে অতি সহজেই। বোধহয় তাঁর অজ্ঞাতে আর অনিচ্ছায় প্রসঙ্গ বদলে গেছে। ধারাবাহিকভাবে জীবনকথা বলবার ইচ্ছাই বোধহয় তাঁর ছিল না তাই কত যে অপ্রাসঙ্গিক গল্প ভীড় করে এসেছে তার ঠিক নেই।

কিন্তু এই সমস্ত গল্পের মধ্যেও কয়েকটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যাতে তারাশঙ্করের জীবন কিছুটা ধরা পড়ে আমাদের কাছে। বিশেষ লক্ষ-নীয় হলো তাঁর মায়ের কথা। মায়ের কথা যখনই উঠেছে তখনই ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে তাঁর লেখা আবেগকম্পিত হয়ে ওঠে। তাঁর মা যে তাঁর

জীবনের কতখানি এ কথা তিনি জোরের সঙ্গে বারবার বলেছেন। তাঁব কথা বলতে বলতে তারাশঙ্কবেব সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আত্মবিশ্লেষণ না করলেও পাঠকসমাজ সহজেই বুঝতে পারেন যে মা'ব প্রভাব তারাশঙ্কবেব জীবনে কত গভীর কত ব্যাপক। তাঁব মাকে তিনি 'প্রতিভাময়ী' বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন "আমার মা এলেন আমাদের বাড়ীতে। বয়স তখন পনেরো। পনেবো বছবের মেয়েটি বাড়ীতে পা দেবামাত্র গোটা বাড়ীটাব চেহাবা ফিবে গেল। বাবাব সমস্ত ঔদ্ধত্য মহিমাময গাম্ভীর্যে পবিণত হ'ল; পবিমিত গণ্ডীব মধ্যে তিনি যেন শান্ত হয়ে সাধনামগ্ন হলেন .. .. পিসীমা সেবায় স্নেহে ধীবে ধীবে প্রশান্ত হযে এলেন। বাড়ীব শ্রী ফিবলো।" সমস্ত সংসাবে তিনি সেদিন ভাঙনেব মধ্যে শান্তিব সুব এনেছিলেন। আমাদেব দেশেব যে সব গৃহিণীবা তাঁদেব ব্যক্তিত্বে, স্নেহে সংসাবেব বাশ ধরেন অতি কঠিন হাতে তাবাশঙ্কবেব মা তাঁদেব একজন তো বটেই, তাঁদেব চেযে তিনি কিন্তু অনেক বেশী। তিনি নিজেই একটা যুগ তিনি নিজেই একটা কালেব প্রকাশ। ভক্তিউচ্ছল লেখক বলেছেন "কাল পবিবর্ত্তনেব ক্ষণে আমাব মা আমাদেব বাড়ীতে পদার্পণ কবে প্রসন্না শক্তিব মতো কাজ কবেছেন। শুধু রুচিব দিক্ থেকেই নয়, ভাবেব দিক্ থেকেও তাঁব মধ্যে তিনি এনেছিলেন নূতন কালকে। আমার জীবনে মা-ই আমাব সত্যসত্যই ধবিত্রী, তাঁব মনোভূমিতেই আমাব জীবনের মূল নিহিত আছে, শুধু সেখান থেকে বস গ্রহণ কবেনি, তাঁকে আঁকড়েই দাঁড়িয়ে আছে। ওই ভূমিই আমাকে বস দিয়ে বাঁচিয়ে প্রেরণা দিযে বলেছে আকাশলোকে বেড়ে চল, সূর্য আরাধনায় যাত্রা কর। তুলে ধর তোমার জীবন-পুষ্প দিয়ে সূর্যার্ঘ্য।"

সূর্যবন্দনার মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে।

জীবনের রাজপথে যাত্রা সুরু করার প্রথম মন্ত্র তিনিই যুগিয়েছিলেন, তাই পথচলার কবি পথের ছন্দে অধীর হয়েও সেই জীবনগুরুকে ভুলতে পারেন নি। বাইরের জীবনের নানা ছন্দ নানা রস নানা আনন্দ ভোগ করার যে মন কবি পেয়েছিলেন সে মন যেমন একদিকে গভীরভাবে রসগ্রহণের ক্ষমতা পেয়েছিল অন্যদিকে একটা প্রশান্ত নিরাসক্তি তার গভীরতার পরিচয় বহন করতো। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনেকটা জুড়ে আছেন মহর্ষি। শিবনাথশাস্ত্রীর আত্মজীবনীর অনেকটা জুড়ে আছেন মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। তেমনি তারাশঙ্করের আত্মজীবনীর প্রধান চরিত্র হয়েছেন তাঁর মা।

তাঁর মার রূপবর্ণনা, সাহস, স্থৈর্য আর ধৈর্য বর্ণনায় তারাশঙ্কর তার 'সেকালের কথা'র অনেক পাতা ভরে তুলেছেন। দুঃখে স্থির, বিপদে অচঞ্চল তাঁর মা। কিন্তু তাঁর শৈশব যেমন করে তাঁর মার স্নেহচ্ছায়ায় কেটেছে তেমনি করে কতখানি প্রভাব যে তাঁর পরবর্তী জীবনেও পড়েছে সেটা বোঝবার কোন উপায় নেই। ভবিষ্যৎ জীবনের যে সংঘাতে সংঘর্ষে মানুষের পরীক্ষা হয় সে সংঘাতের কোন ছবি তারাশঙ্করের 'সেকালের কথা'য় নেই। তাই তাঁর মার প্রসঙ্গ ভাব-প্রবণতার সীমা ছাড়িয়ে যায়নি। তাঁর জীবনের কর্মস্রোতের সঙ্গে তাঁর মার শিক্ষার কি যোগ তা পাঠকের জানা হলো না। প্রশ্ন রয়ে গেল পাঠকের মনে। এই যদি গল্পের সূত্রপাত হয় তবে সে গল্পের শেষ কী? এই প্রশ্ন যদি ওঠে তবেই লেখকের এই গল্প বলা সার্থক হয়।

তারাশঙ্করই বোধহয় একমাত্র লেখক যাঁর আত্মকথা গ্রামের পরিবেশে লেখা হয়েছে। গ্রামজীবনের যে সমস্ত সংঘাত, ছোটখাটো টুকরো টুকরো সংকীর্ণতাজাত যে সমস্ত দলাদলি, উচ্চবর্ণের যে অত্যাচার নিম্ন-বর্ণের উপরে তার নিপুণ ছবি তিনি দিয়েছেন। যে গ্রাম তার লাল

মাটির পরিবেশ নিয়ে তারাশঙ্করের উপন্যাসের পটভূমিকা রচনা করেছে সেই গ্রাম তাঁর প্রথম চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। ছোটবেলার সেই দিনগুলো সেই লালমাটির সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে আছে। সেই গ্রামীন জীবন থেকেই তিনি তাঁর পরবর্তী কালের সাহিত্য-সাধনার উপাদান যোগাড় করেছেন। তারাশঙ্কর সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে অজাত-শত্রু নন। কিন্তু যতবড শত্রুই হোক না তাঁর এ অপবাদ তারাশঙ্করকে কেউই দিতে পারবে না যে তাঁর দৃষ্টি বাস্তব-বিমুখী ছিল। আশে পাশে যে সব মানুষ দিন রাত্রি ঘুরে বেড়াচ্ছে তারাই তাঁর সাহিত্যের মধ্যে আপনাদের খুঁজে পায়।

'সাড়ে সাতগণ্ডার জমিদার' তারাশঙ্করের একটি অনবদ্য ছোট গল্প। জমিদারীর সেই ভাঙ্গনের দিনে "গ্রামের জমিদারের আয় পাচ থেকে সাত-আট হাজার। কিন্তু তাতেই তাদের প্রবল পরাক্রম। সমারোহ প্রচুর। এছাড়া চাষের জমির সঙ্গে পঞ্চাশ থেকে পাচশো হাজার-টাকা বাৎসরিক আয়ের জমিদার অনেক, হাতপায়ের আঙ্গুলে গোণা যায় না। তাঁদের পরাক্রম কম নয়। তাঁরা বলতেন 'মাটি বাপের নয়, দাপের।" এই কথাটি বেদবাক্য করে ঐ ছোটগল্পের নায়ক বলে বেড়ায় গলা হাঁকিয়ে 'মাটি বাপের নয় দাপের।'

গ্রামে জমিদার-বাড়ীতে মহাধুমধামে জগদ্ধাত্রী পূজা হতো। "পঞ্চ-গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, শূদ্র, হরিজন ভোজন হ'ত। মনে আছে চারটে হিসেবে বড বড় ছানাবড়া...প্রচুর মাছ, প্রচুর মাংস। খাইয়েদের ব্যবস্থা ধরাবাঁধা নয়, যে যত পারে...তারপর বিসর্জনের দিনবারুদের কারখানা, লাঠিয়ালদের লাঠিখেলা, প্রতিমা নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা, ছেলেবেলায় সে এক পরম কামনার দিন ছিল। 'দুই পুরুষ' নাটকের প্রথমেই কঙ্কনার বাবুদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী-পূজার ধুমের কথাটা সেই স্মৃতি থেকেই এসেছে।"

সেকাল কী ভাবে তাঁর লেখায় জায়গা খুঁজে নিয়েছে তার আর একটা উদাহরণ দিই। "কৌলীন্যের দোর্দণ্ড প্রতাপ তখনও ঘরে ঘরে কন্যারা বিবাহের পরেও পিতৃগৃহে থাকেন। পিতৃগৃহে তাঁদের অবশ্য দোর্দণ্ড প্রতাপ। আমার দুই পুরুষে মুটুর মুখে আছে 'ব্রাহ্মণের ভগ্নী উপবীতের চেয়েও বড়, উপবীত থাকে গলায়, ভগ্নীর স্থান মাথায়।' এ সেই আমলের কথা।" এমনি করে শুধু ব্যক্তি নয় জীবনযাত্রার অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনাও তাঁর লেখায় আপনা আপনি এসে গেছে।

'ধাত্রীদেবতা'য় শুধু তাঁর মাকেই নয়, জীবনের ঘটনাও যথাযথ তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছেন। প্রথম রাখীবন্ধনের দিন তাঁর বড়মা তাঁর মায়ের হাতে রাখী বেঁধে দিলেন। মা একটি রাখী বেঁধে দিলেন তাঁর হাতে, মন্ত্র বল্লেন - বাংলার মাটি—বাংলার জল "এই ঘটনাটির উল্লেখ 'ধাত্রীদেবতায়' আছে। 'ধাত্রীদেবতা'র মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের খানিকটা সাদৃশ্য আছে।"

আর বলেছেন 'স্বর্ণ ডাইনী'র কথা, গোঁসাইবাবার কথা। স্বর্ণ ডাইনী বাংলা সাহিত্যের আসরে বাণীর গৌরবে বিরাজ করবে। রবীন্দ্রনাথ এই গল্প পড়ে বল্‌লেন "পড়তে পড়তে আমি যে চোখে দেখতে পাচ্ছি, স্বর্ণ দুপুরবেলা বসে আছে আর সামনে তালগাছটার মাথায় চিলটা ডাকছে। আমাদের দেশের এঁরা ইউরোপের উইচক্র্যাফ্‌টের কথা অনেক পড়েছেন। শহরে থাকেন গ্রামের ডাইন দেখেন নি। তাই উইচ নিয়ে গল্প হলেই মনে করেন, বিদেশ থেকে না বলে ধার করেছে।" আর লিখেছেন গোঁসাইবাবার কথা—'ধাত্রী দেবতা'র রামজী সাধু। তিনি ছিলেন ডাইনের ওঝা, মন্ত্র জানতেন।

এমনি করে কত কে যে এসেছে তারাশঙ্করের কল্পনালোক থেকে তার শেষ নেই। 'আমার কালের কথা' লেখা হবার আগেই তারা

সাহিত্যের আসর জুড়ে বসেছে। বাংলা দেশের রাজনৈতিক নব-জাগরণের ঢেউ গ্রামেও লেগেছিল। সচেতন মনের পরিধিতে দু-একটা খাপছাড়া ঘটনার অস্পষ্ট আভাস ছাড়া কিছু নেই। তারাশঙ্কর সেদিনকার হঠাৎ ঝলসে ওঠা ঘটনার ছায়াবলম্বনে গল্প লিখেছেন। পরবর্তী কালের বিচারবুদ্ধি সেদিনকার শিশুর অবাক্‌বিস্মিত দৃষ্টির উপর আরোপ করেন নি।

কিন্তু আপনার অজান্তেই তাঁর লেখায় ঐতিহাসিক ঘটনাও ঢুকে গেছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর মত স্বচ্ছ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি লিখতে বসেন নি। কিন্তু তবু জীর্ণ ভগ্নদশা সমাজতন্ত্র কেমন করে খসে খসে পড়ছে সে কথা তাঁর 'সেকালের কথা'য় গল্পচ্ছলে বলা হয়েছে। ছোটবেলার সেই স্মৃতিগুলিই তাঁর 'সেকালের কথা।' অন্য যে কোন আত্মজীবনীর তুলনায় তা অসম্পূর্ণ। যে মানুষ ঐ পরিবেশে বেড়ে উঠলো, শিক্ষা পেল, যার বুদ্ধি জাগ্রত হলো সে মানুষটার আর কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না—আট বছর বয়সে এসেই সে কাহিনী থেমে গেল। অবনীন্দ্রনাথের 'আপন কথা' যখন পড়ি তখন যেন স্বপ্নলোকে ঘুরে বেড়ানো এক শিশুর কথা পড়ি, সে শিশু রূপকথার রাজকুমার। তার ভবিষ্যৎ না পেলেও মনে কোন ক্ষোভ থাকে না কিন্তু তারাশঙ্কর নামে যে শিশু সে তো শুধু আপন-কথা বলেনি সে বলেছে তার কালের কথা। তাই যখন সে কালের কোন পরিণতি দেখি না, যখন সে কাল যেন তার কথা অসম্পূর্ণ রেখেই শেষ হয়ে গেল তখনই ক্ষোভ থাকে যে এই ধারা কোথায় চললো। অমন যার মা বীর্যবান্ যার পিতা, কত বিচিত্র ধরণের মানুষে যার মনের পটভূমিকা রচনা করেছে সে মানুষটার কি হলো। এ গল্পের শেষটা না শুনলে যেন মন খুসী হয় না। অবনীন্দ্রনাথের লেখনীর যাদুতে সব ছবি হয়ে গেছে, সব চরিত্র

রূপকথার রাজলোকে উড়ে গেছে ডানা মেলে, সে গল্পের শেষ না পেলেও দুঃখ নেই।

তারাশঙ্করের কালের কথা আসলে আত্মজীবনী নয়—এটা স্মৃতিমন্থন তাও অসম্পূর্ণ। তাঁর অন্তর্লোকবাসী কবি তাঁর ছোটবেলার আবছা-অস্পষ্ট জীবনের কথা বলেছে নিঃসঙ্কোচে, কোন পাণ্ডিত্যের ভাণ নেই কোন বড় তত্ত্বকথা বলার দায় নেই, সবটা মিলিয়ে এ এক শিশু মনের ফুটে ওঠার অপূর্ব ইতিহাস।
